পঞ্চম অধ্যায়

নারী চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ

নারীচরিত্রের রূপ ও স্বরূপ

ছোটগল্পের বিচিত্ররূপ—বহুবিধ তার রীতি। দুনিয়ার সবকিছুই ছোটগল্পে ঠাঁই পেয়েছে। দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজসমস্যা, রোমান্টিক জীবনবোধ, শিহরণ, ব্যঙ্গ, রঙ্গ, কৌতুক, নরনারীর প্রেম, ব্যক্তিত্বের সমস্যা প্রভৃতি উপকরণ ছোটগল্পে বিধৃত হয়েছে। তাই ছোটগল্পের সীমাহীন বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ঘটনা, চরিত্র, বিষয় ইত্যাদিকে অবলম্বন করে তাকে একটি নিজস্ব জীবনবোধিতে, একটি দর্শনে, একটি স্বগত ভাবলোকে পৌঁছে দেওয়াই ছোটগল্পকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রথমদিকে ছোটগল্প রোমান্টিক ভাবাবেগে ছিল পূর্ণ। 'কল্লোল' যুগে আসে এক অজ্ঞাত বন্ধন থেকে অপরিচিত এক মুক্তিলাভের দুর্বার রোমান্টিক পিপাসা। এই বিশ শতক হল সংশয়ের, হতাশার, প্রত্যয়ভঙ্গের যুগ। শিল্পীর চিন্তার মানসপটে ভেসে উঠল। "Plain living and high thinking." ইংরেজী শিক্ষা যতই এদেশে বেড়েছে ততই এদেশীয়দের আত্মোপলব্ধির চেতনা বেড়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়ে। শিক্ষিত বেকারত্বের সংখ্যা ঊর্দ্ধমুখী হয়, চারদিকে হতাশা। ফ্রয়েড-এর তত্ত্বকে বাস্তব পটভূমিতে প্রয়োগ করে যৌনচিন্তাকে ইংল্যান্ডের চিকিৎসা বিজ্ঞানী হ্যাভলক প্রতিষ্ঠা দিলেন। পৃথিবীব্যাপী অবসন্নতার যুগে ফ্রয়েড-এর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের তরুণ সমাজ গ্রহণ করল। নরনারীর প্রণয় সম্পর্কের গুপ্ত রহস্যদ্বার উন্মোচিত হল। যৌবনের নিষিদ্ধ কৌতূহল জানার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাকে বিজ্ঞান সমর্থিত হয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন নব্যশিল্পীগণ। প্রণয় প্রবৃত্তির জটিলতা, অতৃপ্তি, দেহমনের নগ্নতা, নিরাভরণ ক্ষুধা তৃষ্ণা জড়ানো মানব-মানবীর চরিত্র চিত্রণ বিচিত্র আধারে প্রতিবিম্বিত হয়ে ছোটগল্পে স্থান পেল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বস্তুনিষ্ঠ জীবনের অচলায়তনে সেই অতলান্ত পাতাল-পুরীতে প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাওয়া গেল।

মানুষের মনের গোপন রহস্যের সন্ধানে সকলেই আগ্রহী। মানুষের মনের সন্ধান করতে হলে মনের অজানা দুই প্রকোষ্টের অর্থাৎ অবচেতন ও অচেতন মনের স্বরূপ জানতে হবে। "ফ্রয়েডের" বিখ্যাত তত্ত্ব "স্বপ্ন" ব্যাখ্যা হল এই অবচেতন মনের পথ প্রদর্শক। স্বপ্নের দ্বারাই আমরা আমাদের ইচ্ছাকে কাল্পনিক ভাবে চরিতার্থ করি। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে মানুষের চিন্তার জগতে ফ্রয়েডের রচনা চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অচেতনমন, যৌনতাবাদ, স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, অবাধ ভাবানুষাঙ্গিক চিকিৎসা পদ্ধতি—ফ্রয়েডের এ সব আবিষ্কার মানুষকে অবাক করে দিল। সাহিত্যে, মনোবিজ্ঞানে, নৃতত্ত্বে, সমাজবিজ্ঞানে, চিকিৎসাশাস্ত্রে ফ্রয়েডের প্রভাব হাওয়ায় ভাসা তুলোর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।"[১] চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়িত ফল হল মন। এই মনের উদ্দেশ্য গুলোর উৎসে রয়েছে তিনটি স্তর। যেমন অদস (id) অহং (Ego) এবং অধিশাস্তা (Super-ego)। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো অদসের মধ্যেই অবস্থিত। এই অদসের কাছে মূল্যবোধ বা ভালমন্দ বলে কোনো জিনিস নেই। অদসের একমাত্র লক্ষ্য হল সুখভোগ। অহং এর উৎপত্তি অদস থেকেই। অদসের শক্তিকে ফ্রয়েড কামপ্রেরণা বা Libido বলেছেন। বর্হিজগতের সঙ্গে সংঘাতের ফলে অহং Super ego এর জন্ম দেয়। ঈডিপাস এষণা অর্থাৎ মায়ের ছেলের যৌন আকর্ষণ থেকেই শুরু হয় অধিশাস্তা। অন্তরের অতৃপ্তি নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই থেকে যায়। তার ফলেই সমাজ জীবনে অন্যায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যৌন উন্মাদনায় নারীপুরুষ অন্যায় করে বসে তার অবচেতন মনের প্রেরণায়। চেতনমনের পর্দায় যখন কৃতকর্মের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় তখন মানুষ দুঃখ অনুভব করে থাকে। সুইডিশ গল্পকার "পার লাগোরভিস্ট" এর "The lift that went down into hell" গল্পে স্বামীর নিষেধ অগ্রাহ্য করে যৌনক্ষুধার তাড়ায় শহরের ধনী ব্যবসায়ী স্মিথের অঙ্কশায়িনী হতে যায়। সন্ধ্যায় তারা দুজনে সুরাসক্ত হয়ে ছাদে আকাশ ভরা চন্দ্র তারা দেখে লিফটে চড়ে নীচের ঘরে নামতে থাকে। এই সংকীর্ণ পরিসরে নামবার সময় পরস্পরে চুম্বন করছে। এমনি করে অনেকক্ষণ কেটে যায়। লিফট্ তবু থামছে না, লিফট্ থামল এসে একেবারে নরকের দ্বারে। শয়তান এসে সামনে দাঁড়াল। শয়তান বলে যে তাকে দেখে ভয় পাবার কারণ নেই। নরকে আজকাল যন্ত্রনা দেওয়া হয় না। তাদের আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিল শয়তান। নায়কও নায়িকার যখন বহুদিনের প্রত্যাশা নির্জনে পরিতৃপ্তি হতে চলেছে তখনই ঘরে ছায়া মূর্তিকে মদের গ্লাস নিয়ে ঢুকতে দেখল নায়িকা—এ তো তার স্বামী। কপালে তার গভীর ক্ষত। মেয়েটি বুঝতে পারল যে তার দুর্ব্যবহারে মর্মাহত হয়ে স্বামী রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করেছে। এই দৃশ্য অসহ্য বলে মেয়েটি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। ভোগ করে মানসিক যন্ত্রনা। তীব্র অনুশোচনার ফলে সে আবার উপরে ওঠার অধিকার পেল। অবচেতন মনের দ্বারা কৃত-অন্যায় চেতনমনের শুদ্ধতায় পরিশুদ্ধ হয়ে নায়িকা নবজীবন লাভ করল।

"Ibsen"-এর "Dolls House" এর নায়িকা "Nora", "Bernard Shaw" এর "Arms and the man" এর "Raina" D. H. Lawrence" এর উপন্যাস প্রভৃতি সম্পূর্ণ ফ্রয়েডিয়ান তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বাংলা ছোটগল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথ। "গল্পগুচ্ছ" ও "তিনসঙ্গী"তে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র স্বভাবের নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। তাদের জটিল দ্বন্দ্ব মুখর জীবন ও ব্যক্তিত্বের রহস্যময়তা এবং সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্প ছাড়াও

উপন্যাসেও তিনি নারীর বিচিত্র চরিত্র চিত্রণ করেছেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর প্রেম প্রথমে ছলনা, ক্রমান্বয়ে প্রলোভন, চাতুরী, আত্মসমর্পণ ও নিবেদন, পূজা ও আরতির মধ্যে দিয়ে শুদ্ধতা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও নারীজাতির হৃদয়ের অতৃপ্তিজনিত খেদ বড় হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর দাম্পত্যজীবনে অশান্তি দ্বিতীয়া স্ত্রী কুন্দনন্দিনীর জন্যে স্বামীনগেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করে গৃহত্যাগ করে। কুন্দর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছেন সূর্যমুখী। আবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল চরিত্র বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে ভ্রমর চরিত্র। ভ্রমরের নিঃস্বার্থ ভালবাসার মূল্য গোবিন্দলাল দেয়নি। তাই অভিমানহত ভ্রমর স্বামীর কাছে থাকতে চায়নি, সে মৃত্যুর পর জন্মান্তরে সুখী হতে চেয়েছে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়ম "পতিগত প্রাণা" এই ধারণাকে সে অবিশ্বাস করেছে। এই উপন্যাসের রোহিণীর তৃষ্ণা শুধু প্রেমে আবদ্ধ নয় তা জীবনতৃষ্ণায় আশ্লিষ্ট। "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে বিমলার চরিত্রও গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও অতৃপ্তির যন্ত্রনায় ক্ষতবিক্ষত। শরৎচন্দ্র বাংলাদেশে নারীজাতির প্রতি অবহেলা ও সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের লেখনী নিয়ে আবির্ভূত হন। যদিও সামাজিক সংস্কারের উর্দ্ধে তিনি সর্বত্র উঠতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এর একদিকে মহিমের শান্ত, ভাবাবেগহীন সরল আহ্বান অন্যদিকে অর্থের গর্বে, উন্মত্ত আবেগে সুরেশের ব্যাকুল আহ্বান এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে অচলার চরিত্র ক্ষতবিক্ষত। "শেষপ্রশ্ন"-এ কমলাও অতৃপ্ত হৃদয়ের চরিত্র। একই পুরুষকে নিয়ে সারাজীবন জোড়াতালি দিয়ে থাকতে চায়নি।

এবারে কয়েকজনের গল্প নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের "পোষ্টমাষ্টার' গল্পে রতন পোষ্টমাষ্টারের সেবা করতে গিয়ে পরিচারিকা, ভগিণী ও জননীতে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার রোগশয্যায় পোষ্টমাষ্টারের পাশে থাকতে থাকতে রতন তাকে ভালবেসে ফেলেছে। 'শাস্তি' গল্পে চন্দ্ররার প্রবল অভিমান তাকে জীবন বিমুখ করে তুলেছে। বিরামহীন মানসিক যন্ত্রনার 'টেল' 'নষ্টনীড়' গল্পটি। চারুলতার অবচেতনস্তরে অমলকে পাওয়ার জন্যে প্রেমের আসন পাতা হয়েছে ফলে স্বামী ভূপতির সঙ্গে ব্যবধান বেড়েছে। সর্বতোভাবে পরাভূত ও বিপর্যস্ত হয়ে চারুলতা নিরবচ্ছিন্ন মানসিক যন্ত্রনার তুষারগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে। "স্ত্রীর পত্র" গল্পে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার ও অন্ধআচার সর্বস্বজীবন থেকে মুক্তি পাবার সংগ্রাম ও মাতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অটল মৃণাল। রবীন্দ্রনাথের "দেনাপাওনা" মূলতঃ পণপ্রথা কেন্দ্রিক। বাঙালী সমাজে কুপ্রথার ফলে এক অনূঢ়ার বিবাহোত্তর জীবনের শোচনীয় পরিণতি। নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে পনের টাকা বাকী থাকার জন্যে নির্মম লাঞ্ছনা পেয়েছে। নিরুর অবচেতন স্তরে যে না পাওয়ার হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল। তার ফলেই তিলে তিলে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নারীজীবনের সুখ ও দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, নৈরাশ্য-অভীপ্সা, কদর্যতা-ইতরতা, মাহাত্ম্য ও নীচতা সবই ধরা পড়েছে রবীন্দ্র গল্পের সৃষ্টনায়িকাদের মধ্যে।

শরৎচন্দ্র প্রেমের বিচিত্র রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে চেয়েছেন। নির্লিপ্ত, উদাসীন, নিরাসক্ত স্বামীর মন জানতে জঘন্য পথের আশ্রয় নিয়েছে ধনবতী, অভিমানিনী কমলা "কাশীনাথ" গল্পে। শেষে অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে, নিজ কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পেরেছে। স্বামীর পদতলে আশ্রয় নিয়েছে। নারীর মাতৃত্বকে উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা হিসাবে শরৎচন্দ্র অঙ্কন করেছেন, "রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", "মেজদিদি"; "অভাগীর স্বর্গ" তে বাগদী ঘরের বৌ অভাগী স্বামী প্রত্যাখ্যাতা হয়েও পুনঃ বিবাহের বা চরিত্র হননের সুযোগ পেয়েও পথভ্রষ্টা হয়নি। আবার ব্রাহ্মণ জমিদার গৃহিণীর শবদাহের সমারোহে মুগ্ধ হয়ে নিজের জন্যেও ঐরূপ চিতা সজ্জা কামনা করেছে। যদিও বৈষম্য সমাজ ব্যবস্থা ও দারিদ্র্য হেতু তা সম্ভব হয়নি।

এরপর আসে "কল্লোল" যুগ। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে এই পর্বের লেখকগণ ব্রাত্য, পতিত নীচুতলার অখ্যাত নরনারীর জীবনের সুখ-দুঃখের কথা লেখেন। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর হতাশা ক্লিষ্ট, দারিদ্রে জর্জরিত মানুষ সাম্রাজ্য বাদীর বিরুদ্ধে জাতীয় উত্তাল তরঙ্গে নিষ্ফল আন্দোলনে এগিয়ে যায় যুবশক্তি, অন্যদিকে ফ্রয়েডের অবচেতন লোকের আবিষ্কার সেইসঙ্গে মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রতি ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষন্নতাবোধ, নৈঃসঙ্গ বিষাদ, অতৃপ্তি সংশ্লিষ্ট জীবনের ছবি উপন্যাস ও গল্পে বিধৃত হয়। যৌবনের স্বপ্ন বিলাস, আদর্শ পূজা, অবক্ষয়, যৌনপ্রবৃত্তির আতিশর্য্য, কলঙ্কের বেসাতি, বিদ্রোহীচেতনা ইত্যাদি কল্লোলের লক্ষণ প্রবোধ কুমার সান্যালের লেখায় স্পষ্ট। আবার রাণীগঞ্জ ঝড়িয়া প্রভৃতি কয়লা খনিতে কর্মরত অসংখ্য আদিবাসী নরনারীর বিকৃত যৌনতা, দ্বন্দ্ব জটিলতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার লৌহশৃঙ্খল শাসনের চাকায় নিরীহ নারীদের অমানবিক ও নির্মম নির্যাতনের কথা চিত্রিত। তাঁর "কয়লা কুঠী" "নারীর মন" "নারীমেধ" প্রভৃতি গল্পে এর প্রমান মেলে। 'বিহ্বল ভাববিলাস, বাস্তবের দিকে ঝোঁক, দরিদ্র নিম্নবিত্তের প্রতি পক্ষপাত, স্বপ্ন ও সংগ্রাম বিমুখতা-এইসবের যোগফল কল্লোলের মানসিকতা, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য কুমারের গল্পে তার রূপায়ণ হয়েছে।" (২) প্রেমেন্দ্র, মিত্রের "বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে" গল্পটিতে এক পতিতার বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার কাহিনী স্পষ্ট। ক্ষুধাতুর বারাঙ্গনার অতৃপ্তি চোখে পড়ে। পরকীয়া প্রেম প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতে সার্থক হয়েছে। যেমন স্টোভ, 'ভস্মশেষ', 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' প্রভৃতি গল্পে। "সংসার সীমান্তে" এক বারাঙ্গনা রজনীতে চোর অঘোর এর পারস্পারিক

প্রেম, ভালবাসা এই নোংরা জীবন ত্যাগ করে দুজনে সুখের সংসার গড়ার স্বপ্নে বিভোর। হঠাৎ ধার শোধের কুড়ি টাকা জোগার করতে চুরি করতে যায় এবং ধরা পড়ে পাঁচবছরের জেল হয় অঘোরের। কলকাতায় নোংরা কুৎসিত পথের ধারে বিগত যৌবনা রজনীর নতুন পথিকের আগমনের আশায় অন্ধকারে ক্ষীন ডিব্বার আলোয় হতাশ নয়নে প্রতীক্ষা, এই অসাধারণ সৃষ্টি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখনীতেই সম্ভব। অচিন্ত্যবাবু সম্পর্কে বলা যায় 'উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, ভবঘুরে জীবনযাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌনচেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেমচেতনা, আত্মসন্ধানী ব্যক্তির অস্তিরতা, ব্যর্থতা, স্বপ্নপ্রবনতা, সবটা মিলিয়ে অচিন্ত্যকুমার।" (৩)

এরপর তারাশঙ্করের পর্ব। কিন্তু তার আগে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পকর্মের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। রোমান্টিকতার উচ্ছ্বাস, ভাবাবেগের আতিশয্য, উচ্ছল যৌবনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বপ্নবিলাস-ই ছিল কল্লোলীয়দের বিদ্রোহী চেতনা। তারই পাশাপাশি ছিল হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি। যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিতৃষ্ণ করে তোলে। বস্তুতঃ জীবন রহস্যময় ও গতিশীলতাকে চালনা করে অনিবার্য শক্তি হৃদয়ে অবদমিত 'ইদ' ও 'লিবিডো' এই দুই শক্তি ও যৌন বৃত্তি। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মনোবিকার বিদ্যায় অভিজ্ঞ হয়ে মার্কসীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে লেখার জগতে প্রবেশ করেছেন। সমাজ বিজ্ঞানীর মত মধ্যবিত্ত সমাজের ছলনা, প্রতারণা, কদর্যতা, ভন্ডামিকে উন্মোচিত ও বিশ্লেষিত করেছেন কঠিন বাস্তবতার কাঠগোরায় দাঁড় করিয়ে। জীবন শিল্পী মানিক কোনদিন মুখোশ পরে কাব্য সংসারে আবির্ভূত হন নি, এটাই তাঁর অহংকার। তিনি নিজেই বলেছেন," সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ অবলম্বন করে নয়। বাস্তবতাই মধ্যবিত্তের জীবনে ও চেতনায় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যে সংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যে সংঘাত আমার জীবনে ও চেতনায় প্রকট হয়েছিল, সাহিত্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছিল এই বিদ্রোহ।" (৪) মানিকের যৌনব্যাপার সম্পর্কিত অসুস্থ মনোবিকারের সার্থক রূপায়ণ "চতুষ্কোণ" উপন্যাস। এই পর্যায়ের গল্প হিসাবে "সর্পিল" দিবারাত্রির কাব্য" উল্লেখযোগ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'অতসীমাসী' "বৃহত্তর ও মহত্তর" গল্পে নারীর মনোবিকার ও যৌন অস্থিরতার চিত্র স্পষ্ট। "স্নেহ প্রেম মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মুর্চ্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধ যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধন শুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের কাজটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল, তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য, তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখদেখে আমার মনে হল, রাঁধুনীর কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ শৈশবে স্নেহ করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।" [৫] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে শ্রীকুমারবাবু বলেছেন, "ছোটগল্প ও উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নানা মুখী বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য মৌলিকতা দেখাইয়াছেন তাহাই তাঁহার উদ্ভট অবাস্তবতা ও যৌন বিষয়ের প্রতি অতিপক্ষপাত সত্ত্বেও তাঁহাকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করিয়াছে।" (৬)

'কল্লোল' যুগে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংশয়, অস্থিরতা, নাস্তিক্যবুদ্ধির প্রাবল্য, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি বিদ্রোহ, রোমান্টিক পাশ্চাত্ত দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যে প্রতিফলিত রবীন্দ্রভাবের বিরোধী মনোভাব নিয়ে। "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরূদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন" (৭) লেখকদের রচনায় শুরু হয়েছে। ঠিক তখনই পল্লীবাংলার বিশেষ করে রাঢ় বাংলার বৈষ্ণব সমাজের রসমধুর প্রেম কাহিনী, নৈতিক বন্ধনমুক্ত পরকীয়া প্রেম সম্বলিত গল্প নিয়ে উপস্থিত হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু কল্লোলীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে শিল্পীর বেশীদিন সম্পর্ক স্থায়ী হল না। মাত্র তিনটি গল্প "কল্লোলে" প্রকাশ হয়েছিল হারানো সুর, রসকলি ও স্থলপদ্ম। এর কারণ তারাশঙ্কর শহুরে লেখক নন, তিনি পল্লীর লেখক—রাঢ়ের মাটি আর মানুষের রূপকার। অচলায়তন সমাজ জীবনের পরিবর্তিত রূপের কারিগর। তাই তিনি কল্লোলীয় না হয়েও আধুনিক শিল্পী। তারাশঙ্করের গল্পে আস্তিক্য বোধই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

তারাশঙ্কর তার ছোটগল্পে ও উপন্যাসে নারীর বিচিত্রলীলা ও গতির বর্ণনা দিয়েছেন। "নীলকণ্ঠ" (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর) তে গিরি, রাইকমল" (১৯৩৪ সেপ্টেম্বর) তে রাইকমল, 'আগুন' (সেপ্টেম্বর ১৯৩৭) এ মীরা, 'কবি' (মার্চ ১৯৪২) বসন ও ঠাকুরঝি, কালিন্দী (১৯৪০) তে সাঁওতাল রমনী সারী, নাগিনীকন্যার কাহিনী (সেপ্টেম্বর ১৯৫১) তে নাগীনকন্যা, সপ্তপদী (ডিসেম্বর ১৯৫৭) তে 'রিনা, মহাশ্বেতা (জুলাই ১৯৬০) এর নীরা, সুতপার তপস্যা (১৯৭১) তে সুতপা ইত্যাদি নারী চরিত্র বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক জটিল রহস্যে পরিপূর্ণ। 'গনদেবতা' উপন্যাসে অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্ম মনস্তাত্ত্বিকতায় সার্থক। "মঞ্জরী অপেরা "(বৈশাখ-১৩৭১) তে বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার ছবি স্পষ্ট। যাত্রাদলের সুরাসক্ত যৌনচর্যা, অতৃপ্তি অস্থির জীবনতৃষ্ণা প্রতিফলিত। সমাজের অপাংক্তেয়, বে-পরোয়া মনোভাব, সামাজিক বন্ধনের ধার ধারে না অথচ মঞ্জরী দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে অনন্যা।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পগুলিতে নারীর বিচিত্ররহস্য অত্যন্ত প্রকট। রাঢ়বাংলার অশিক্ষিত আচারহীন যৌনসর্বস্ব গোষ্ঠীজীবনের প্রতিনিয়ত অসংগতি তাঁর নিখুঁত তুলির টানে বিধৃত। নারীচরিত্রের এই জটিল রহস্যের মাঝে পাঠকদের

দাঁড় করিয়েছেন তিনি। কেবলমাত্র বাঙালীর নানান সমাজের নারীর প্রতি সামাজিক বিধান ও সামাজিক অবস্থানই আলোচনা নয়-তারই সঙ্গে রহস্যময়ী নারীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বকেও উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর সাহিত্যে নারী চরিত্রগুলি প্রায়ই সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে মানবধর্মের হারজিতের দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ। বেশীর ভাগ অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী চরিত্র ঘরের বন্ধন অপেক্ষা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোকেই বেশী পছন্দ করে। অরুগ্ন বলিষ্ট হিংস্র নগ্ন বর্বরতা কেই আশ্রয় করেছে। তারাশঙ্কর দেশসেবা ও রাজনৈতিক কাজে পরিব্রাজকের মত প্রত্যন্ত পল্লীতে ঘুরেছেন। তিনি দেখেছেন রাঢ় মাটির স্বভাব রুক্ষতায় চরিত্রগুলি আপাতদৃষ্টিতে অমার্জিত। গ্রামজীবনের নিম্ন জাতীয়া চরিত্রগুলি প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে বিচিত্র রহস্যের উন্মীলন ঘটিয়েছে। তাদের রিক্ত অমার্জিত জান্তব প্রবৃত্তি সামাজিক বিধি নিষেধ অনায়াসে অতিক্রম করে। নারী হৃদয়ে লুক্কায়িত নানা কলা-কৌশল, রহস্যময়, চালচলন, বিচিত্রগতি, অত্যাশ্চর্য কর্মধারা, কখনও সুতীব্র ভোগলিপ্সা, আবার কখনও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা। প্রেমের আকর্ষণে কখনও নারী স্বৈরিণী, আবার ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় কখনও দানবিনী—এই হল রাঢ়ের লোকায়ত জীবনের নারীচরিত্র। বাহ্যিক সারল্যে ভরপুর বলে মনে হলেও আন্তঃ চরিত্র বৈচিত্র্যে পূর্ণ।

একটি ছকের সাহায্যে তারাশঙ্করের সৃষ্ট নারী চরিত্রের গতিপ্রকৃতি দেখা যেতে পারে ঃ—

১। নীতি নিষ্ঠতা।

২। মাতৃত্ব

৩। পবিত্রতা।

একস্বামী বহুস্বামী অন্যপুরুষে

৪। সংকীর্ণতা।

৫। ছলনাময়ী।

৬। দ্বন্দ্ব, (সংস্কার লব্ধমন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব)

৭। ব্যাভিচারিণী (সামাজিক জীবনে বাস করেও অন্য পুরুষে আসক্তা)

৮। বারাঙ্গনা (মানবতাবাদ ও আশা আকাঙ্ক্ষা)

বলপূর্বক ইচ্ছাকৃত

৯। ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল

১০। অভিভাবকের অমতে প্রতিলোম বিবাহ।

১১। বিলাসিনী।

১২। প্রেম।

১৩। মিথ্যাভাষিণী।

১৪। অভিনেত্রী।

এখন ছক অনুযায়ী লেখকের গল্পগুলির আলোচনা করা যেতে পারে—

১। নীতিনিষ্ঠতা ঃ—নারী জীবন বহু ধারায় বিভক্ত। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসনে বন্দিনী হয়েছে চিরকাল। উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে অন্ত্যজ স্তরের নারীদের পুরুষেরা "কিনেছে অল্প দামে" । লোকায়ত জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা, ঘাত প্রতিঘাত, যৌন সমস্যা জনিত ঘটনার উত্থানও পতন নারী চরিত্রঅবলম্বনে রচিত হয়েছে। জীবনের চলার পথে এক একটি লক্ষ্যকে অবলম্বন করে রমণী বাঁচতে চায়। সেই লক্ষ্য বা নীতিথেকে কিছুতেই সে সরে আসতে পারে না। তার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত থাকে। এর উদাহরণ অনেক গল্পে পাওয়া যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের "স্ত্রীর পত্র" যেখানে পনেরো বছর ধরে পত্নীজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছে, "মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ পত্নীত্বে নয় নারীত্বে, পত্নীত্ব নারীত্বের অংশমাত্র।" (৮)

বড় বৌ ঃ—স্বচ্ছল মধ্যবিত্তের পারিবারিক কাহিনী। দুভাই ও দুই বৌ এর সুখের সংসার। সেতাব সরকার বড়ভাই, মিথ্যাবাদী অথচ তার স্ত্রী সুন্দরী ও বন্ধ্যা কাদু তার দেওর আত্মভোলা মহাতাপ কে সন্তান সম ভালবাসে। মহাতাপের স্ত্রী মানদা সন্দেহ করে, তথাপি কাদু বাৎসল্য-প্রেমের পথ থেকে নিজেতে গুটিয়ে নেয় না। সেতাবের কৌশলে সংসার ভাঙে; ভাইকে ঠকায়। কাদু এত লাঞ্ছনা সহ্য করেও নগদ টাকা স্বামীর কাছ থেকে চুরি করে ভোর রাত্রে মহাতাপকে দিয়ে আসে। সেতাব কাদুকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ নিলেও কাদু এতটুকু দুঃখ করে নি। মিথ্যা সন্দেহের জাল ছিন্ন করতেও চেষ্টা করে নি। মহাতাপকে সন্তানসম দেখত কাদু। এই কথা যেমন সে কাউকে বলেনি, আবার মহাতাপকে তার দাদা ঠকিয়ে নিক, এটাও সে সহ্য করতে পারে নি। একজন যথার্থ শান্তিময়ী জননীর নীতি থেকে কিছুতেই কাদু ভ্রষ্ট হয় নি।

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ঃ—অকৃতদার, তান্ত্রিক চণ্ডীরায়ের জীবনের একমাত্র মমতার স্বর্ণসূত্র বিধবা ভাগিনী চিন্ময়ী। চিন্ময়ী জীবনে সব হারিয়ে মামাকে সন্তানসম স্নেহ ও মমতায় আচ্ছন্ন করে রাখে। চণ্ডী তার সমস্ত সম্পত্তি ভাগ্নীর নামে লিখে দেয়—যা চিন্ময়ীর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ। চিন্ময়ী কেবল মদ্যাসক্ত, আত্মভোলা মামার সুখের জন্যে চিন্তা করে। চণ্ডীকে ঠকিয়ে যখন মদের দোকানের মালিক সুদখোর গিরীশ জমি গ্রাস করতে এগিয়ে আসে, তখনই চিন্ময়ী মামার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে জমির উপর নিজের দখল দাবী করে। মামা তাই আদালতে মিথ্যা কথা বলে, চিন্ময়ীকে মিথ্যাবাদিনী সাজিয়ে সব সম্পত্তি মামলা করে কেড়ে নেয়। দুঃখে, ঘৃণায় ও অপমানিতা চিন্ময়ী নীতিভ্রষ্টা হয়নি। তাই সে ঘর থেকে চিরদিনের জন্যে নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়ায়। চণ্ডী মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে এলে চিন্ময়ী সেবিকার মত তাকে সেবা করেছে, মামার সমস্ত আবদার নীরবে পালন করেছে। কিন্তু যখনই তাকে মিথ্যাবাদিনী সাজিয়েছে তখনই চিন্ময়ী নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। যাবার সময় সে নিজের জিনিস কটাই নিয়ে গেছে। মামার কোনকিছু স্পর্শ করে নি। স্নেহ ও ভালবাসায় যদি একবার আঘাত আসে তাহলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। চিন্ময়ী মামাকে সুখী করতে ও মামার ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তাকে বড় করে দেখেছিল কিন্তু যখনই সে দেখল যে এখানে থাকলে তার নীতির কোন মূল্য থাকবে না, তখনই সে পালিয়ে গেছে।

কালোমেয়ে ঃ—সারাজীবন আদর্শকে, আঁকড়ে ধরে শিক্ষকতা করে শেষ জীবনে পঙ্গু হয়ে যান উপীনবাবু। দুই পুত্র আদর্শ ভ্রষ্ট হয়েছে। একমাত্র কন্যা অত্যন্ত কালো নাম সুমতি। স্ত্রী মারা গেছেন, ছোট ছেলে পড়াশুনা করে। জীবন সায়াহ্নে উপীনবাবু কন্যাটির বিয়ে দেবার জন্যে শেষ সম্বল বাস্তু ভিটা বিক্রির উদ্যোগ নেন। কিন্তু সুমতি বাবাকে বলে যে সে বিয়ে করবে না। বৃদ্ধবাবার সুখের জন্যে সে দোকানে কাজ নেয়, সুমতি অত্যন্ত কুৎসিত বলে সে ভেবেই নিয়েছে যে এই নিষ্ঠুর সমাজব্যবস্থায় সে মূল্য হীন, তাই দাম্পত্য সুখ ভাগ্যে নেই। তাই বিয়ে না করে বাবা ও ভাইটির সেবা করে যাবে— এই নীতিতে বিশ্বাসী হয়েছিল সুমতি। বাবা বাড়ী বিক্রি করবে সুমতিরই বিয়ের জন্যে। সুমতি নীতিভ্রষ্টা হতে চায় নি। তাই সে বাবাকে বলে "আমার বিয়ে দেবেন না বাবা। আমি কালো।" রাত্রির মত সুমতি সূর্যকে পাবার আকাঙ্ক্ষায় তপস্যা করে যাবে। বাবা ভাইকে পথে ভাসিয়ে নয়।

মানুষের মন ঃ— সুভাষিণী পল্লীগ্রামের ধনীর কন্যা। এগার বছর বয়সে বিয়ে হয় শিক্ষিত চিন্তাশীল স্বদেশী 'ভবেন্দ্র'র সাথে। দারিদ্রের যন্ত্রনায়, সন্তান হীনা মাতৃত্বের জ্বালায় সুভাষিণী উপার্জনহীন স্বামীকে তিরস্কার করে। সুভাষিণী বিরাট ধনী হতে চায় নি। সে চেয়েছিল উপার্জনশীল স্বামী" ধনী বাবার উপর করুনা ভিক্ষাকে সে ঘৃণা করত। এই নীতি বোধে বিশ্বাসী ছিল বলেই সে অক্ষম স্বামীকে ভর্ৎসনা করে। স্বামী নিরুদ্দেশ হলে, আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বাপের বাড়ি গেলেও আবার স্বামীর ভগ্ন কুটিরে ফিরে আসে। চরকায় সুতো কেটে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে। এরপর স্বামী প্রচুর অর্থের মালিক ও মদ্যপ হয়ে দেশে ফিরলে, সুভাষিণী স্বামী দর্শনের পূর্বেই আত্মহত্যা করে। সুভাষিণীর নীতি ছিল উপার্জন করে সৎভাবে সাধারণ জীবন যাপন করা। যে স্বামীর চিন্তা ছিল পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার অভিপ্রায় অথচ সেই স্বামীই অসৎভাবে, ইংরেজদের অনুগ্রহে ধনীও মদ্যপ হয়ে আদর্শকে বির্সজন দিয়েছে। এই স্বামী তো সে চায় নি। এর জন্যেই তো সে দীর্ঘদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে নি। নীতি ভ্রষ্ট হবার আগেই তাই গ্লানির চাপে মৃত্যুবরণ করেছে।

প্রত্যাখ্যান ঃ— পল্লীর গৃহস্থের কিশোরী গীতা দেশকর্মী সুকুমারের সংস্পর্শে এসে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে ও সুকুমারকে ভালবাসে। দেশ স্বাধীন হবার পর সুকুমার গীতাকে বিয়ে না করে M. A. পাশ এক রূপসীকে বিয়ে করে। ভালবাসা প্রত্যাখ্যাতা গীতা নতুন জীবন শুরু করতে জেদের বশে গ্রামের বিপত্নীক প্রৌঢ় পন্ডিতকে বিয়ে করে। পন্ডিতমশাই গীতাকে ভালবেসেছিল ও পেতে চেয়েছিল। গীতা পন্ডিতকে স্বামীত্বে বরণ করে একেবারে আদর্শ হিন্দু রমণীতে পরিণত হয়েছিল। যদিও সে বিধবা হয়েছিল। গীতা সুকুমারকে পাবার জন্যে জীবনে দুঃসাধ্য কাজ করেছে। সুকুমারের মন জয় করতে নিজেই নিজের ও সুকুমারের নামে দেওয়ালে কুৎসিত মন্তব্য লিখেছে অথচ সুকুমার তাকে গ্রহণ করে নি। তাই সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিয়ে করেছে। সুকুমারের অস্তিত্বকে গীতা ঘৃণা করেছে। সুকুমার বিপত্নীক হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। যাবার পূর্বে তার সমুদয় সম্পত্তি গীতাকে উইল করে পাঠায়। গীতা তা প্রত্যাখ্যান করে। যে ব্যক্তি ভালবাসার মর্যাদা দেয় নি তার সম্পত্তিকে গীতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ হিসাবেই দেখেছে। নীতির পরিবর্তন করে নি।

ধাত্রী পান্না এই নীতিবোধের জন্যেই নিজ পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে অপরের পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন।

২। মাতৃত্ব ঃ—নারীর জীবনের সার্থকতা তাঁদের মাতৃত্বে। সন্তান কামনায় বিবাহিতা রমণী জীবনের যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ অনায়াসে বিসর্জন দেয় আবার সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রনা অকাতরে সহ্য করে। বৃক্ষের সার্থকতা যেমন ফলে, নারীর সার্থকতা তেমনি সন্তান প্রাপ্তিতে। সন্তানহীনা রমণীদের চিত্তে যে কী করুণ দুঃখ সঞ্চিত থাকে তা লেখকের কয়েকটি গল্পে পাওয়া যায়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিম্ন সর্বস্তরেই এই কামনা প্রকট।

স্থলপদ্ম ঃ—বিধবা বেলে সন্তান কামনায় দিশাহারা। সে সন্তানের জন্যে হারা বাউরীকে সাঙা করে। অন্যের ছেলে-মেয়েদের সে আদর করে এবং তারও এমন সন্তান হবে বলে সে স্বপ্ন দেখে। মেলায় গিয়ে হারা যখন বেলের জন্যে নানা সামগ্রী কিনে আনে বেলে তখন ঝুমঝুমি, ঝিনুক বাটি, অনাগত ছেলের জন্যে কিনে আনে। এই অনর্থক খরচে হারা প্রতিবাদ করলে বেলে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বেলে তখন অন্তঃসত্ত্বা। ক্ষুধায়, অনাহারে পরিশ্রমে বেলের বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে যায় এবং বেলে পাগলের মত হয়ে যায়—শ্মশানে গিয়ে পুত্রের জন্যে কাঁদে, কারও কথা তার কানে যায় না—সে শুধু সন্তান কামনায় পাগল।

রাজারাণী ও প্রজা ঃ—তারাশঙ্করের স্ত্রী ও একজন মাতা। অন্য মাতার মতই তিনিও নিজ সন্তানের জন্যে যেমন ধাত্রী তেমনি অন্যের সন্তানের জন্যেও তাঁর হৃদয় কাঁদে। নারীহৃদয় এমনই কোমল ও স্নেহপ্রবন। লেখক জমিদার। অবাধ্য প্রজা রাইবল্লভ খাজনা না দিলে তিনি তাঁর উপর রুষ্ট হন এবং প্রজাদের গাঁয়ে গিয়ে তাকে শাস্তি দেবার মনস্থ করেন। রাইবল্লভের স্ত্রী উপায়ান্তর না দেখে পুত্রদের সঙ্গে করে গোপনে লাভপুরে রাণীমার কাছে আসেন। রাণীমার মাতৃহৃদয় বিগলিত করুণায় সিক্ত হয় এবং রাইবল্লভের সন্তানকে নিজের কাছে রেখে নিজ পুত্রসম পালন করেন।

পুত্রেষ্টী ঃ—পুত্রকামনায় এমনই উদগ্রীব হয়েছিলেন জমিদার মেজকর্তার স্ত্রী যে স্বামীকে দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণে উৎসাহিত করেন। জমিদার গণেশ বাঁড়ুজ্জে একসময় পোষ্যপুত্রের জন্যে স্বীয় ভ্রাতার পুত্রকে চেয়েছিলেন কিন্তু না পাওয়ায় পাগল ও কৃপণ হয়ে যান। স্ত্রীর বারংবার অনুরোধেও মেজকর্তা পোষ্যপুত্র নেন নি। হঠাৎ একদিন রাজী হন, তার কারণ হল এক তান্ত্রিক তাঁকে নিজ পুত্রের জন্যে অপরের পুত্র বলি দেবার কথা বলেন। মেজগিন্নী এসব জানেন না। তাই অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মাতৃত্বের আহ্বানে চাটুজ্জেদের অনাথ ভাগ্নেকে তিনি আনেন। কি অপার আনন্দে আত্মহারা থাকেন গিন্নীমা। রাত্রে আপন পুত্রসম তাকে নিজের কাছে নিয়ে শুতেন। এই মাতৃত্বে কোন খাদ ছিল না। তাই হয়ত গণেশ বাঁড়ুজ্জে ঘুমন্ত ছেলেটাকে শ্মশানে বলি দিতে গিয়েও পারে নি। মেজকর্তা নিজের ভুল বুঝতে পারেন, মেজগিন্নীও পুত্রকে ফিরে পান।

মতিলাল ঃ—নিঃসন্তান মতিলাল ও স্ত্রী ভুবন হাড়ি মাতুলালয়ে বাস করে। উভয়েই সন্তান কামনায় বিভিন্ন দৈবী কৃপালাভের চেষ্টা করে। ভুবন হাতে মাদুলী পরে। কিন্তু যখন কুৎসিত বলে মতিলাল অন্যায়ভাবে গ্রামবাসীর হাতে প্রহৃত হয়, তখন আর সন্তান কামনা করে না, কারণ সে ভাবে সন্তান তাদেরই মত হয়ত কুৎসিত হবে এবং সমাজে ঘৃণার পাত্র হবে। কিন্তু ভুবন তা মানতে চায় নি কারণ ভুবন তো নারী। তথাপি স্বামীর অপমানে সেও স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাই মতিলাল ভুবনের হাতের মাদুলী খুলে ফেলে দিতে গেলে ভুবন কোন কথা বলেনি। কেননা তার সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। ভুবনও তাই মতিলালের কথার সত্যাসত্য উপলব্ধি করে কোন প্রতিবাদ করে নি।

জন্মান্তর ঃ—হৈমবতী জমিদার বলরাম চাটুজ্জের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান স্ত্রী। বিচক্ষণা রমণী জমিদারী নিপুনতার সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬১ সালে জমিদারী বিলোপ আইনে এ জমিদারী চলে যায়, সেই সঙ্গে সতীনের ছেলে নীলুর দুর্ব্যবহার দুই-ই মিলে হৈমবতীর চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হয়। সন্তানহীনা হৈমবতী নীলুর মধ্যে আপন সন্তানের স্বপ্ন-সার্থক করতে পারেন নি তাই তিনি বৃন্দাবন যাবার সংকল্প নেন। আসক্তি মুক্ত হবার প্রাক্কালে নীলুর চার বছরের শিশুটিকে দেখে তিনি শিশুটির মধ্যে নিজের সন্তানের চিত্র অনুভব করেন। এই শিশুর ছোট্ট মুখখানি আজীবন সন্তানবুভুক্ষু বিধবার জন্মান্তর ঘটায়। তিনি তাঁর সারা জীবনের অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ নীলুর ছেলেকে পেয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির নেশায় বৈরাগ্য ত্যাগ করে সংসার জীবনে প্রত্যাবর্তন করেন।

শঙ্করীতলার জঙ্গলে ঃ—বাপমায়ের আদরের কন্যা গীতা। স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হলেও স্বামীর মৃত্যু হয়—রেখে যায় দেড় বছরের এক কন্যা। গীতার স্বামীর সংসারে অন্যভাইরা সব সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার জন্য গীতার মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাইলে গীতা সন্তানের জন্যে শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করে বাপের বাড়ী চলে আসে। সবকিছুর অধিকার ত্যাগ করে। ঘনশ্যাম দাস গীতাকে সাঙা করতে চায়। ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে দুটি বিয়ে করেছে ও ছেড়েছে। গীতা ঘনশ্যামকে সাঙা করতে চাইলেও কিন্তু মেয়ের জন্যে প্রথমে রাজি হয়নি। শেষে মেয়েটাকে ঘনশ্যাম নিজের মেয়ের মর্যাদা দেবে বলে দেবতার দিব্যি দিলে, গীতা তবেই রাজী হয়। বিয়ের পর ঘনশ্যাম গীতার মাঝখানে অপরের কন্যা টুলুকে সহ্য করতে পারেনি—তাকে মারতে চেয়েছে। গীতা জীবন দিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ঘনশ্যাম তাকে হত্যা করে। গীতা আদালতে সাক্ষ্য দিলে ঘনশ্যামের ফাঁসি হয়। এখানে দাম্পত্য প্রেম মাতৃত্বের কাছে পরাজিত হয়েছে। গীতা সন্তান হত্যাকারীকে রাক্ষস হিসেবে দেখেছে, স্বামী হিসেবে দেখতে পারে নি।

চোরের মা ঃ—মাতৃহৃদয় স্থান, পাত্র, আপন-পর বিচার করে স্নেহবর্ষণ করে না—তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই গল্পটি। ডোম জাতির রক্তে মিশে থাকা চৌর্যবৃত্তির কলঙ্ক স্পর্শ করেছিল পিতৃহীন মায়ের একমাত্র সন্তান ফিঙেকে। সে ধরা পড়ে প্রহারে মারা যায়। চোরের মা বলে ফিঙের মা কাঁদতে পারে না। যে চৌধুরী ফিঙেকে পিটিয়ে মেরেছিল,

তার পুত্রের মৃত্যু হলে ফিঙের মা আক্রোশের পরিবর্তে গ্রামের বাইরে নির্জন প্রান্তরে বসে কেঁদেছে। চোরের মাও যে সত্যকারের আদর্শ জননী হতে পারে, যে কোন অন্যের পুত্রের শোকে কাঁদতে পারে তা দেখা যায় এখানে।

বোবাকান্না ঃ—এই গল্পে এক বোবা-কালা নারীর জীবনেও যে মাতৃত্বের কোমল তৃষ্ণা লুকিয়ে আছে তা দেখা যায়। জগৎ-জীবন সম্পর্কে অনাসক্ত আনুঠাকুরের সে বিধবা স্ত্রী। নির্বাক মায়ের কথা কেউ বুঝতে পারে না। কিন্তু যেদিন তার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হল, সেদিন বোবা মায়ের এক অদ্ভুত চিৎকার প্রকাশিত হয়—যা উপলব্ধি করতে হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাত্রা করতে হয়।

কান্না ঃ—ছেলে বিক্রি করত চুড়িওয়ালী নামে এক মহিলা। সে জনি নামে এক ছোট হিন্দু জাতের ছেলেকে বিক্রি করতে নিয়ে আসে, কিন্তু তাকে বিক্রি করতে পারে নি। নারীর মাতৃত্বের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়েছিল জনি। ছেলে বিক্রি করা ব্যবসা হলেও তার অন্তরে বাৎসল্য-প্রেম ছিল। নিষ্ঠুর রাক্ষসী হৃদয়হীন নারী কখনও যে আদর্শ মা হতে পারে, তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পতিব্রতা ঃ—সাবিত্রী-সত্যবানের দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রাচীনকাল থেকেই নারী-মনে সংসার ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রোথিত—স্বামীই হল রমণীর সর্বস্ব, অলংকার, অর্থ, সম্মান, গর্ব, সবকিছু। স্বামীর দুঃখে স্ত্রী দুঃখী, স্বামীর সুখে স্ত্রী সুখী। স্বামীকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতার ন্যায় পূজার্ঘ্য নিবেদন করে রমণী সমাজ। রমণীর কাছে তাই ধর্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ হল স্বামী। কোন রমণী বিধবা হলে কঠিন নিয়ম মেলে চলে। আবার অন্ত্যজস্তরেও পাতিব্রত্যের সুন্দর নিদর্শন মেলে। কোন রমণী আবার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছে এবং তাকেও একনিষ্ঠভাবে সেবা করেছে, আবার কেউ কেউ বিবাহ না করেও প্রেমিককেই জীবনের ধ্রুবতারা বলে মেনে নিয়েছে। তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে স্বামীগতপ্রাণা রমণীর চিত্র পাওয়া যায়—যারা আপন সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। যদিও তারাশঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন যে "আমার সাহিত্যে নবদম্পতির বা তরুণ-তরুণীর রাগ-অনুরাগ, বিরহ-মিলনের কথা ও চিত্রের অভাব আছে।" [৯] রাঢ় বাংলার চিরন্তনী রমনীদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সেবা, মাতৃত্ব, মহত্ত্ব ইত্যাদি গুণগুলি কতকগুলি গল্পে বিধৃত, যা পল্লীজীবনের রোমান্টিকতার আবেশের নিখুঁত তুলির টানে তিনি একেঁছেন—

হারানো সুর ঃ—বৈষ্ণব গাহর্স্থ্য-জীবনের চিত্র। ননী দিবারাত্র বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়, সংসারের অভাব-অভিযোগে কান দেয় না। পরে ননী গভীরভাবে সংসারে ডুবে যায়। বাঁশি বাজায় না, গম্ভীরভাবে কেবল চাষবাস করে চলে। এভাবে আড়ষ্ট জীবন যাপন অসহ্য হয়ে ওঠে গিরির কাছে। সে চেয়েছিল স্বামী সংসারে কাজকর্ম করুক, সেই সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে মধুর আলাপনের যেন ঘাটতি না হয়। ননীর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনে গিরি বৃন্দাবন যাবার মনস্থ করে। ননীর নিষেধ সে শোনে না। ভোর রাতে ননী একা বাঁশি বাজাতে শুরু করে। গিরি বৃন্দাবন যাবার সংকল্প ত্যাগ করে স্বামীর কাছেই থেকে গেছে। গিরির কাছে স্বামীর ঘরই বৃন্দাবন মনে হয়েছে। কারণ এতদিন পর সে তার মনের মত স্বামীকে পেয়েছে।

শ্মশানের পথে ঃ—দামিনী চরিত্র সতীত্বের এক উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা। দামিনীকে ভালবেসে প্রতিবেশী সুবল সবসময়ে দামিনীর অভাবের সংসারে নানা ভাবে সাহায্য করে। দামিনী সুবলকে স্নেহ করে, কিন্তু ভালবাসে স্বামী গোষ্টকে। সুবল দামিনীকে উপকার করার জন্যে প্রতিদান চায়, কিন্তু দামিনী ফিরিয়ে দেয়। একদিন সুবল রাতের অন্ধকারে দামিনীকে ভোগ করে করলেও দামিনী চিৎকার করে না। দামিনীকে অসতী বলা যাবে না। দামিনী সুবলের আকাঙক্ষায় নীরবে নিজেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলিয়ে দিয়েছে। তারপর ঘৃনায়, লজ্জায় দামিনী লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকোবার চেষ্টা করে, মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। একদিকে প্রতিদান, অন্যদিকে সতীত্ব — এই দুইয়ের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত দামিনী সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল।

নারী ও নাগিনী ঃ—নিম্নজ শ্রেণীর মধ্যেও নারীদের জীবন এক স্বামীত্বে আসীন। খোঁড়া সেখ উদয়নাগ সাপ ধরে তাকে সাঙা করলে স্ত্রী জোবেদা সহ্য করতে পারেনি। তার সতীনের জ্বালা অসহ্য মনে হয়েছে। স্বামীর ভালবাসা হয়তো তার উপর কমে যাবে এই ভেবে সে সাপটাকে সহ্য করতে পারেনি। স্বামীর ভালবাসার প্রতি জোবেদার সংশয় জাগে তাই স্বামীকে দিয়ে সাপটাকে জঙ্গলে ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছে। জোবেদা স্বামীকে সম্পূর্ণ ষোল আনাই ভোগ করতে চেয়েছিল।

কুলীনের মেয়ে ঃ—কুলীনের মেয়ে তরুবালা—ছোট জমিদারের একমাত্র আদরের কন্যা। কুলীন বর বিপদ তারণের তার সঙ্গে বিয়ে হয়। বিপদতারণ বহুপত্নীক, মদ্যপ—সে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা তরুকে দেয় নি। উপরন্তু তরুর জীবনে দিয়েছে অসীম লাঞ্ছনা ও অত্যাচার। তরুর জীবনে মাঝেমাঝে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে সে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়। যতবারই বিপদ তারণ এসেছে ততবারই তরু তাকে স্বামীর আসনে বসিয়েছে। দুঃখ, কষ্ট, ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেও সতীত্বকে সে বিসর্জন দেয়নি। স্বামীর প্রতি তার গোপন শ্রদ্ধা অটুট।

তারিণী মাঝি ঃ—দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল চিত্র। সুখী ও তারিণী পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। সুখীর পতি-ভক্তি ছিল অটল। তারিণী উন্মত্ত ময়ূরাক্ষীতে সাঁতার কেটে ঘোষেদের নববধূকে উদ্ধার করে পুরস্কার হিসাবে সুখীর জন্যে কানের নথ চেয়েছে। আকণ্ঠ মদ পান করে বাড়ীতে সুখীকে নথের কথা বলাতে সুখী আনন্দিত না হয়ে স্বামীর বিপদের আশঙ্কায় শিউরে ওঠে। সে বলে "কোনদিন ওই করতে গিয়ে আমার মাথা খাবে তুমি। এবার আমি গলায় দড়ি দেব কিন্তু।" তারিণীকে সেবা, যত্নে, ভালবাসায় সর্বদা মগ্ন রেখেছে সুখী। রাত্রির ভূষণ চন্দ্র, পত্নীর অলংকার তার স্বামী—এই কথার প্রমাণ সুখীর স্বামী ভক্তি।

পদ্ম বৌ ঃ—পাঠশালার শিক্ষক চন্দ্র মশাইয়ের কুষ্ঠরোগ দেখা দিলে ছাত্রবৃত্তি পাশ তাঁর স্ত্রী পদ্ম প্রথমে বাপের বাড়ি পালিয়ে যায়। পদ্মের বাবা মেয়েকে স্বামী সেবার কথা বলেন এবং মহাভারতের উদাহরণ দিয়ে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে নিয়ে সতীর বেশ্যাগৃহে যাবার কথা বলেন। পদ্ম বাবার কাছ থেকে পাতিব্রত্যের আদর্শে দীক্ষিতা হয়ে স্বামীগৃহে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বামী সেবা করতে থাকেন। এদিকে কুষ্ঠরোগের জন্যে পাঠশালায় ছাত্র আসে না এবং সংসারে দারিদ্র্য নেমে আসে। পদ্ম বৌ ধানভেঙ্গে চালকুটে সংসার চালাতে ও স্বামীসেবা করতে থাকেন। দেবতার উপর বিশ্বাস রেখে স্বামীসেবা করলেও একদিন এই দুরারোগ্য ব্যাধি তাকেও আক্রমন করল এবং তাতেই তিনি মারা গেলেন—রেখে গেলেন স্বামী সেবার সার্থক দৃষ্টান্ত।

সমুদ্রমন্থন ঃ—দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাংলার বুকে অনাহার ক্লিষ্ট শত শত ভিখারী ও ভিখারিনীর দল পথে পথে ভিক্ষে চেয়ে বেড়ায়। সকলেই জৈববৃত্তির নাগপাশে বন্দী। এরই মাঝে এক দম্পতির নৈসর্গিক প্রেম পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থি-মজ্জা সার করা এক খনা ভিখারী রমণী ভিক্ষালব্ধ যা কিছু পায় তা নিজে না খেয়ে অসুস্থ স্বামীকে খাওয়ায়। পাতিব্রত্যের এখানেই শেষ নয়। ডাক্তার স্বামীকে মাংস খাওয়াতে বলায়, খনা মেয়েটি রাতে জমিদার উমানাথ বাবুর গোয়াল থেকে ছাগল চুরি করতে আসে এবং ধরা পড়ে। মূর্চ্ছিতা অবস্থা থেকে একটু জ্ঞান ফিরলেই গৃহের বাইরে রুগ্ন স্বামীর কাশি শুনতে পেয়ে সে বলেছে—"মরে যাঁবে, বুঁকে হাঁত বুঁলিয়ে না দিঁলে মরেঁ যাঁবে।" মৃতপ্রায় স্বামীকে খনা মেয়েটার বাঁচাবার কী আপ্রাণ চেষ্টা। বাবুদের পায়খানা সাফ করে অর্জিত অর্থে ওষুধ আনে, না খেলে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে। স্বামী "গরীবদের মরণ ভালো" এই কথা বললে, চুরির অপরাধও অপমান ভুলে মেয়েটি বলে "এঁই দেঁখ মরণ মরণ কঁরিস না বলঁছি, ভাঁলো হঁবে না।" পতিভক্তির এই অকৃত্রিম নিদর্শনে জমিদার গৃহিণী রমার অন্তঃসারশূন্য পতিভক্তির চকিতে পরিবর্তনে সাহায্য করেছে।

একপশলা বৃষ্টি ঃ—জয়া বাউরী অল্প বয়সেই স্বামীপরিত্যক্তা। বিশ্বযুদ্ধের পর হঠাৎ কনট্রাক্টরীর কাঁচা পয়সায় ধনী চন্দ্রচৌধুরী। চন্দ্রের রক্ষিতা হিসাবে জয়া থেকে যায়। চন্দ্র জয়াকে বিয়ে করতে চাইলেও সে রাজী হয় নি; আবার চন্দ্রকে ছেড়েও যায় নি। চন্দ্রকে অন্যত্র বিয়ের ব্যবস্থা জয়াই করে দেয়। চন্দ্র দুই সন্তান ও স্ত্রী রেখে মারা যায়। ব্যবসায়ে লোকসান ও আনির বদলে পয়সা চালু হওয়ায় চৌধুরী বাবু ভিখারী হয়ে যায়। জয়া দিনরাত পরিশ্রম করে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নেয়। নিজে না খেয়ে চন্দ্রের স্মৃতিকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। এসময় ধনীব্যবসায়ী দে'পরিবারের সেজবাবু জয়াকে চাইলেও জয়া যায়নি। এইভাবে পরপুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও সেবার নিদর্শনের তুলনা মেলা ভার। জয়া পতিসেবার মত সেবা করে গেছে তাকে।

প্রত্যাবর্তন ঃ—তিনবার বিয়ে হওয়ার পর তিনটি স্বামীই মারা গেছে নবীন জেলের মেয়ে রমার। তাই প্রতিবেশী রমাকে বেউলো বা বেহুলা বলে ডাকতো। হঠাৎ তার জীবনে হাজির হল ঘরপালানো পশুপতি। বহুদিন দেশে-বিদেশে জাহাজের খালাসীর কাজ করে ধোপদুরস্ত সাহেব সেজে গ্রামে আসে। নাচের আসরে রমাকে দেখেই তার পছন্দ হয়ে যায়—রমাও তাকে অন্তর দিয়ে ভাল বেসেছে। বিয়ের জন্যে জিনিস কিনতে কলকাতায় যায় পশুপতি। এসেই বিয়ে হবে। বাবা মার অমত বলে পশুপতি গাঁয়ের শেষ প্রান্তে নতুন ঘর তুলেছিল, সেখানেই রমা থাকে। কলকাতা যাবার আগে পশুপতির নিরাপত্তার জন্য রমা মঙ্গলচন্ডীর মাদুলী হাতে বেঁধে দেয় কিন্তু পশুপতি আর ফেরে না। রমা ভাবী-স্বামীর নতুন ঘরেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তিনটি স্বামী হারিয়েও সে ধৈর্য রেখেছিল। পশুপতিকে সত্যই স্বামীত্বে বরণ করেছিল, তার হাতে মাদুলী দিয়েছিল কিন্তু তার পরেও যখন পশুপতি ফিরে আসল না তখন জয়া হয়ত ভেবেছে যে তার দাম্পত্য জীবন দেবতারাও চান না। তখনই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গেছে ও সে আত্মহত্যা করেছে। বহুপুরুষের বাহুলগ্না হলেও রমা পশুপতিকে পেয়ে তাকে পতির আসনে বসাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

অহেতুক ঃ—ঘোষ জায়া বিকৃতমস্তিষ্ক, কাউকে সে সহ্য করতে পারে না। ঈর্ষাকাতরা, অসুস্থ শরীর তথাপি স্বামী-সেবার ত্রুটি নেই। সকলের সঙ্গে অহেতুক কোন্দল করাই তার স্বভাব, সন্তানহীনা তথাপি পতিকে দেবতার আসনে বসিয়ে সেবা করে।

সুরতহাল রিপোর্ট ঃ—নিম্নজ বাউরী সমাজের রমণীদের মধ্যে কেবল দেহজ প্রবৃত্তিই সবসময় বড় হয় না,

কখনও কখনও অসত্য থেকে সত্যের দিকে, অসুন্দর থেকে সুন্দরের দিকে উদগমন করে। কড়ি বাউরীর স্বামী চৌকিদার ছিল। কড়ি স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বর গ্রহণ করে নি এমনকি সুস্থভাবে বাঁচতে গিয়ে যখন কামুক পশুস্তরের জীব হরেরাম পোদ্দারের চোখে পড়ে তখন সতীত্ব রক্ষার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। কড়ি ছিল চৌর্যবৃত্তিতে আসক্ত। এই চুরি করার জন্যে প্রায়ই স্বামীর কাছে প্রহৃত হত কিন্তু কড়ি প্রতিবাদ করত না—এটা তার প্রাপ্য বলেই মেনে নিত। সেই পতির মৃত্যুর পর সেও পতির অনুগামিনী হয়েছে গলায় দড়ি দিয়ে। বাউরী সমাজে ব্যাভিচারী জীবন যখন স্বীকৃত বা পত্যান্তর সামাজিক বিধিসম্মত তখন কড়ি সতীত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে।

চোরের মা ঃ—ডোম পরিবারে বহুস্বামী গ্রহণ সমাজে প্রচলিত অনুকূল বিধান, তা সত্ত্বেও ফিঙের বাবা মারা যাবার পর ফিঙের মা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে নি। ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝি গিরি করে ফিঙেকে মানুষ করেছে। ছেলে ডাকাতি করতে চাইলেও মা বারংবার নিষেধ করেছে। আদর্শজননী, পতিব্রতা স্ত্রী হিসাবে ফিঙের মার চরিত্র অনবদ্য।

আবার "এ মেয়ে কেমন মেয়ে" গল্পে বিশালাক্ষী ডোমপরিবারের স্ত্রী হয়েও সতীত্ব রক্ষা করেছে।

৪। সংকীর্ণতা ঃ—নারী-চরিত্র যেমন ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল, স্বামী-সন্তান সেবায় নিবেদিতা প্রাণ, পর-আপন সকলকে আপনার মত করে দান করে স্নেহ, মায়া ও প্রেম, নিজ স্বার্থ মুহূর্তে অপরের জন্যে সর্বস্ব অকাতরে দান করতে পারে, নিজের সুখ-শান্তি বিলিয়ে দিয়ে মাথায় নিতে পারে সীমাহীন দুঃখ ও যন্ত্রনা, ঠিক তেমনি আবার সংকীর্ণ মনোভাবেও তারা অদ্বিতীয়া। সংসারে তাই নারী কখনও মায়াবিনী, বরাভয় দায়িনী আবার কখনও ধ্বংস কামনায় রাক্ষসী। সামান্য স্বার্থের জন্যে সোনার সংসার, শিবতুল্য স্বামীকেও ছাড়খার করে দিতে দ্বিধা করেনা। 'মন্থরা' কৈকেয়ীর হৃদয়ে বিষ প্রয়োগ করে রামচন্দ্রের জীবনে করুণ ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করেছিল। সেই মন্থরা সদৃশ হীনমনা নারী জাতির আজও অভাব নেই। তারাশঙ্করের অনেকগল্প আছে যেখানে নারীজাতির সংকীর্ণতা হেতু গল্পের জীবনকে বহুভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন—

বড় বৌ ঃ—সেতাব ও মহাতাপের বিরাট স্বচ্ছল পরিবারের বড় বৌ মাতৃত্ব ও স্নেহের জন্যে মহিয়সী। মহাতাপকে বড় বৌ অত্যন্ত স্নেহ করে। নিঃসন্তান বড় বৌ মহাতাপকে আটবছর বয়স থেকেই পুত্রসম ভালবাসে—এই ঘটনা সংকীর্ণ মানসিক সম্পন্ন পরিবারের কন্যা ছোট বৌ মানদা উপলব্ধি করতে পারে নি। ফলে মিথ্যা সন্দেহের বশে সংসারে অশান্তি নেমে আসে।

আলোআঁধারি ঃ—দারিদ্র্য পীড়িত সংসারে বহুকষ্টে বি, এ, পাশ করে সুখময়। এম, এ পড়াকালীন সুখময় ১৯২১ সালে কোন কারণে জেলে যায়। কিন্তু তার আগেই ধনী ব্যবসায়ী হরিশবাবু নিজ কন্যা সারদার সাথে তার বিয়ে দিয়েছিল। আত্মসম্মান-সচেতন সুখময় দরিদ্র হলেও মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দেয় নি। তাই শ্বশুর বাড়ি থেকে তত্ত্বের নামে সাহায্যের ঝুড়ি আসলে সে স্ত্রীর জিনিস কটা রেখে সব ফিরিয়ে দেয়। সারদা অপমান করলে সুখময় চিরদিনের মত দেশত্যাগী হয়। কিন্তু সতীত্বের মর্যাদা দিয়ে স্বামীর জীর্ণ কুটিরে বসে সারদা স্বামীর আগমনের কাল গোনে। অথচ সামান্য কারণে এতটা নির্দয় ও নির্মম না হলে সুখময় চলে যেত না—যা হোক একটা কিছু করে দুঃখের ভাত সুখে খেতে পারত। সংকীর্ণ মানসিকতা এই দুঃখময় পরিণতির জন্য দায়ী।

না ঃ—অনন্ত অল্পশিক্ষিত জমিদার তনয়। শিকার করা সখ কিন্তু তার মনুষ্যত্ব-বিবেক সবই ছিল। সে বিবাহিত স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দিতে কসুর করে না, সে কালীনাথের চালাকি বুঝেও প্রথমে কিছু বলে না। অনন্ত স্ত্রীকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছে বহুবার, স্ত্রী কিন্তু অনন্তের হৃদয় বুঝতে সক্ষম হয়নি। সে এতই সংকীর্ণমনা যে অনন্তকে অপমান করেছে জ্বালাময়ী ভাষায়—অনন্তকে সে বাঁদরের সঙ্গে তুলনা করেছে। অর্থের অহংকারে অনন্তের স্ত্রী হিন্দু সমাজের বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছে। অনন্ত নিজে নির্দোষ, তাই স্ত্রীর এই তির্যক বাণে দিশাহারা স্ত্রীকে প্রহার করেছে, আবার এই অন্যায়ের জন্যে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ক্ষমা চাইতে গেছে—বিনিময়ে শ্বশুরের চাবুকের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কালীনাথকে হত্যা করে সে জেলে গেছে। অনন্তের স্ত্রী যদি উদার মানসিকতা নিয়ে স্বামীর অন্তর্লোককে উপলব্ধি করার চেষ্টা করত, তাহলে অনন্তের জীবনমরুভূমি হত না বা জেলে পচতে হত না।

তাসের ঘর ঃ—শৈল নাবালিকা বধূ—মধ্যবিত্ত ঘরের কন্যা। মধ্যবিত্ত ঘরের বধূ হয়ে সে এসেছে। স্বভাব চঞ্চলা, অস্থির-মস্তিষ্ক, সহজাত সারল্যে ভরপুর। কিন্তু শৈল মিথ্যাভাষিনী। সে যেখানে থাকে তার বিপরীত বাড়ীর মিথ্যা প্রশংসা করত। যেমন—শ্বশুর বাড়ীতে থাকলে বাপের বাড়ীর এবং বাপের বাড়ীতে থাকলে শ্বশুর বাড়ীর প্রশংসা করত। এই মিথ্যার জন্যেই অমর তাকে বাপের বাড়ীতে রেখে আসে। অবশ্য এসবের মূলে ছিল শাশুড়ীমাতা। অমরের মা যদি মাতৃত্বের অঞ্চল-ছায়ায় শৈলকে রেখে তাঁর স্নেহপ্রবন ভালবাসায় শৈলকে বাঁধতে পারতেন, তবে শৈলর জীবনে এমন দুঃখ আসত না। শৈলর স্বামী নাকি "শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা নেয় অভাবের জন্য"—এই কথা শৈল এক প্রবাসিনীকে বলাতে লজ্জায় ঘৃণায়-শ্বাশুড়ী তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। কথাটা সত্যই গর্হিত। তবু যদি তিনি কথাটাকে হাল্কা করে দেখতেন তবে সংসারে অশান্তি আসত না। অমর এই কথা শুনে যখন শৈলকে বাপের বাড়ীতে রেখে

আসার জন্যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করেছে তখনও অমরের মা এতটুকু নরম হন নি। অত্যন্ত সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়ে তিনি অমরকে প্ররোচিত করেছেন। শাশুড়ীমাতৃসম। নিজের কন্যা যদি এমনটি করতো তাহলে কি তিনি এমন নির্মম হতে পারতেন?

৫। ছলনাময়ী ঃ—নারীহৃদয় শুধু সেবায় আলোকিত নয়, সে কখনও উন্মাদিনী, কখনও স্বৈরিণী, কখনও বা মায়াবিনী, ছলনাময়ী। ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে অন্যায় কাজে প্রবৃত্তও হয়। এই ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে সুখী করতে গিয়ে কেউ কেউ দুঃখের শিকার হয়েছে, আবার কেউ ছলনার আশ্রয় নিয়ে নিজে মুক্ত হয়ে অন্যান্যদের মুক্তিও দিয়েছে, কোন কোন নারী হৃদয়ের অতৃপ্তির জন্যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে, কেউ বা স্বামীর অক্ষমতা দূর করবার জন্যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। নানা উদাহরণের নিদর্শন তারাশঙ্করের গল্পে পাওয়া যায়। লেখক নারীজাতির চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, "তাহারা (নারী) অমাবস্যাকে পূর্ণিমা করিতে পারে, পূর্ণিমাকে অমাবস্যার অন্ধকারে ঢাকিয়া দিতে পারে, দিনকে রাত্রিতে পরিণত করিতেও তাহারা সক্ষম। তাহাদের চক্রান্তে না হয় কি?" (মাছের কাঁটা)। এখানে সামান্য একটা মাছের মাথা নিয়ে দুই ভাইয়ের সংসারে অশান্তির অগুন জ্বেলেছিল দুই বৌ ছলনার আশ্রয় নিয়ে।

আবার "গবিন সিংহের ঘোড়া" গল্পে নবীনের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীর জ্বালাময়ী বাক্যবাণের ফলেই বাপ-বেটায় শুরু হয়েছে অশান্তি। নবীন শ্বশুরবাড়িতে বুড়ো ঘোড়াটার পিঠে চেপে যায়; তাই দেখে শালারা ব্যঙ্গ-কৌতুক করলেও নবীন ততটা দুঃখ পায় নি, কিন্তু রাত্রে শোবার সময় যখন তার স্ত্রী বলেছে, "তুমি ওই ছাগলটায় চেপে আর এসো না।" তখনই নবীনের পৌরুষত্বে বিরাট আঘাত লেগেছে ও পরিণামে সংসারের স্রোত অন্যখাতে প্রবাহিত হয়েছে। নবীন নতুন ঘোড়া এনেছে—বৃদ্ধ 'প্রবীন' ঘোড়াকে সহ্য করতে পারেনি। সংসারে অশান্তির জন্যেই বৃদ্ধ পিতার হার্ট এ্যাটাকে মৃত্যু হয়। নবীন গল্পের শেষে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে বৃদ্ধ ঘোড়াটাকে হত্যাও করেছে—এ সবের মূলে ছিল স্ত্রীর ছলনাময়ী বাক্যবাণ।

"শিবানীর অদৃষ্ট" গল্পে বিধবা সুন্দরী যুবতী শিবানী পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর নিগূঢ় দাম্পত্য-প্রেম দেখে হিংসায় জ্বলতে জ্বলতে মালকিন (লতা) কে হত্যা করার অভিপ্রায়ে কই মাছে বিষ মিশিয়ে খেতে দেয়। কিন্তু সেই বড় কই মাছটি কে খাবে এই নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কির পর ঠিক হয় শিবানী খাবে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে লতাদির কোন ক্ষতি হয় না—শিবানীই বিষমাখা মাছ খায়।

"রাঙাদিদি" গল্পে উদ্ভিন্ন যৌবনা, সুন্দরী অতৃপ্ত যৌবনা রাঙা দিদি পটুয়া বৃদ্ধ স্বামীর স্ত্রী। তাকে পেতে চায় গ্রামের সব তরুণ বিবাহিত যুবকেরা। তাদের সাথে হাসি ঠাট্টা করে রাঙাদিদি তার হৃদয়ের গোপন ক্ষুধা মেটায়। স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেরা রাঙাদিদিকে ঘরের স্ত্রী করতে ভিড় করে। রাঙাদিদি তাদের প্রথমা স্ত্রীকে তালাক দিতে বলে। সকলে যখন এই পর্বের উদ্যোগে ব্যস্ত, তখন রাঙাদিদি গোপনে পালিয়েছে। ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে যুবকদের চোখে প্রেমের বহ্নিশিখা জ্বালিয়েছে, আবার নিজেই সেখানে থেকে বহুদূরে চলে গেছে। আসলে রাঙাদিদি ঈশ্বর-দর্শনে পাগলিনী, তার মনের এই সদিচ্ছা কেউ উপলব্ধি করতে পারে নি, সকলে তাকে ভোগের সামগ্রী ভেবেছে, পূজার নৈবেদ্য ভাবতে পারে নি।

৬। দ্বন্দ্ব ঃ—সংস্কার লঙ্ঘন ও অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব এ গল্পের মূলসুর। "মানুষ গড়ে দেবতা ভাঙে"। নিয়তি তাড়িত প্রবৃত্তির বশে বন্দী মানুষ, মানুষের উত্তরণ তাই উর্ধ্বগামী। কেউ জেতে, কেউ হারে; কেউ বা এই দুইয়ের মাঝে পড়ে দ্বন্দ্ব-জটিলতায় প্রবিষ্ট হয়। মন বা হৃদয় সামাজিক নীতি, বন্ধন ভাঙতে চেয়েছে, কিন্তু সংস্কার তার যাত্রাপথে বিরাট বাধা হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফলে উদ্ভূত অতৃপ্তি তাড়িত ক্ষুধা, তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেহ, যৌবন, চিরশাশ্বত নয় তা জেনেও বিগত যৌবন স্বীকার করতে চায়নি (সখি ঠাকুরুণ), তাই দর্পনে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে বার্ধক্যে রেখা তার হৃদয়কে দুঃখে, যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করেছে।

রসকলি ঃ—গল্পের নায়িকা মঞ্জরী-বিচিত্র রহস্যময়ী। মঞ্জরী গ্রামের সমবয়সী পুলিনের বাল্যসখি। উভয়ের সংসর্গ গভীর প্রেমে রূপান্তর ঘটায় কিন্তু মঞ্জরীর মা সৈরভী ভেকধারী বৈষ্ণব বলে পুলিনের কাকা ও অভিভাবক রামদাস বিয়েতে আপত্তি করে। পুলিনের বিয়ে দেয় গোপিনীর সাথে। পুলিন গোপিনীর গোপন বাধা ছিন্ন করে মঞ্জরীর কাছে আসে। গ্রাম্য কুৎসা, গোপিনীর ঘৃণা, কটাক্ষ উপেক্ষা করে মঞ্জরী সদাহাস্য ও লাস্যময়ী থাকে। পুলিনকে কাছে পেয়েও নিষ্কলঙ্কিণী থাকে। পুলিনের প্রতি নীরব ভালবাসা, দেহ সৌষ্ঠবে উচ্ছলতা, পরিহাস রসিকতা, সর্বদা সহজ ও স্বাভাবিক চালচলন—সত্যই বিস্ময়কর। "চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপছিয়া পড়ে। হাসিতে নিটোল গালে টোল পড়ে, সে গ্রীবাটি ঈষৎ বাঁকাইয়া দাঁড়ায়। নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বাঁধিয়া চুল বাঁধে, কথার ধরনটাও তাহার কেমন বাঁকা। লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতেও তাহার আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।" (রসকলি)। মঞ্জরী চরিত্র বিচিত্র রহস্যে পূর্ণ। কখনও প্রেয়সী, কখনও উন্মাদিনী আবার কখনও শান্তসমাহিতা। অচরিতার্থ প্রেম তার হৃদয়ের গভীরে মধুরিমা রচনা করেছে। মঞ্জরী পুলিনের দাম্পত্য জীবনে ঝড় তুলেছে, আবার সে সেই ঝড়কে প্রশমিত করে দাম্পত্য

জীবনের সংকট মোচনও করেছে। সংস্কারবদ্ধ জীবনই তাকে বৃন্দাবনের পথে নিয়ে যায়। চকিতে আকর্ষণ, আবার চকিতে বিকর্ষণ, কখনও সর্বত্যাগী, কখনও সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় চঞ্চলা, আবার মানবিকতার ঔজ্জ্বল্যে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মঞ্জরী চরিত্র অনন্যা। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাই বলেছেন,—"যেমন আদিম রিপুর তীক্ষ্ণতায়, তেমনি সর্বস্ব বিসর্জনের অকৃত্রিম আনন্দরূপে তারাশঙ্করের গল্পের প্রেমিক-প্রেমিকরা এইভাবেই চিরায়ত মহিমার মুকুটমণি হয়ে ওঠে।" (১০)

চোখের ভুল ঃ—অনাথা বিধবা, সন্তানহীনা উমা। সুন্দরী রূপসী—তাই উমাকে ভোগের বাসনায় ব্যাকুল গ্রামের মহাজন গোকুল। দেবী-আরাধিকা উমা সব কামনাকে জয় করে প্রত্যহ চন্ডীমায়ের মন্দিরে পূজো দিতে যায়। সেখানেই এক সন্ন্যাসীকে দেখে তার অপলক চাহনীতে সে লজ্জা বোধ করে। অন্যদিকে সকলের মাঝখানে সন্ন্যাসী কেবল উমাকেই দেখে। গ্রামে কুৎসা রটে, একদিন রাত্রে গোকুল উমার ঘরে গেলে উমার মৃদু চিৎকারে সেই সন্ন্যাসী গিয়ে বাঁচায়, কিন্তু শয়তান গোকুল সন্ন্যাসীকে ধরে প্রহার করে উমার সাথে মিথ্যা কুৎসা রটায়। অবচেতন মনে অতৃপ্তি থাকলেও সংস্কার-বদ্ধ উমা গ্রাম ছেড়েছে। পথে সন্ন্যাসীর সাথে দেখা হলে উমা সন্ন্যাসীর মনোভাব জানতে চেয়েছে। সন্ন্যাসী উমাকে তার হারানো মায়ের সঙ্গে তুলনা করলে উমা সমস্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মায়ের মতই দাঁড়িয়ে থাকে।

রাইকমল ঃ—কমলিনীর জীবন গভীর মনস্তাত্ত্বিক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পরিপূর্ণ। একদিকে বৈষ্ণবীয় জীবন ও ধর্মের সংস্কার অন্যদিকে অবচেতন মনের সুপ্ত কামনা—এই দুই এর দ্বন্দ্বে কমলিনী ক্ষতবিক্ষত। সে রঞ্জনকে পেতে চাইলেও সামাজিক বিধিনিষেধে তা বাস্তবায়িত হয় না। তাই সে "জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন" যাপনের স্বপ্ন দেখেছে। চন্ডীদাসের রাধার মতই সেও দেহাতীত সৌন্দর্যের সাধনা করতে চেয়েছে। মায়ের সঙ্গে সে নবদ্বীপ ধামে যায়, সেখানে মালাচন্দন করতেও বাধ্য হয় প্রৌঢ় রসিকদাসের সাথে—কিন্তু সেখানেও কামনার বিষাক্ত ক্ষুধা, তাই গ্রামে ফিরে আসে। পথে রঞ্জনকে দেখে সে স্তম্ভিত হয়, কারণ রঞ্জনের মধ্যে তখনও কামনার জ্বালা মেটেনি। গ্রামে লোকনিন্দা, তথাপি কমলিনী গ্রামের আখড়াতেই থেকে যায়। জমিদারের রসিকতার উত্তরে সে বলে, "ভিখারীর ওই তো সম্বল প্রভু।" কমলিনী বৃন্দাবন যায় নি হয়তো রঞ্জনের আকর্ষণেই। "মালাচন্দনের" তুলসী দেবতার পরিবর্তে মানুষকে ভালবেসেছে আর কমলিনী মানুষের মাঝেই কৃষ্ণের সাধনা করেছে।

মালাচন্দন ঃ— মেয়েজাতি স্বামীর ভালবাসার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হতে চায়। যেমন—"নারী ও নাগিনী" গল্পে জোবেদার জীবনে দেখা যায়, তেমনি "মালাচন্দন" গল্পে তুলসীর জীবনেও ঘটে। চোদ্দ বছর বয়সের বিধবা তুলসী সুন্দর গান করে। জয়দেবের মেলায় গিয়ে মোহনদাসের সঙ্গে তার পরিচয় ও মালাচন্দন হয়। স্বামীর ঘরে দেখে প্রথমা স্ত্রী শীর্ণা গৌরভামিনীকে। সে তুলসীকে সহ্য করতে পারত না—তুলসী তবু থেকে যায়। এই ভেবে যে প্রথমা স্ত্রী ভামিনী দুচার দিনেই মারা যাবে এবং সত্যই সে মারা যায়। তুলসী স্বামীর ঘর করতে থাকে, কিন্তু অন্তরের অতৃপ্তি থেকে যায়। তুলসী স্বামীর নিবিড় আত্মসমর্পণ চেয়ে পায় নি, কারণ মোহনদাস ছিল রূপের ভিখারী, হৃদয়ের নয়। তাই মোহনদাস আবার তৃতীয় স্ত্রী যখন ঘরে এনেছে তখনই তুলসীর নারীত্বে, সম্ভ্রমে লেগেছে তীব্র আঘাত। সে ঘর ছেড়ে চলে যায় বহু দূরে। স্বামীর ভালবাসার অভিনয়কে তুলসী সহ্য করতে পারে নি।

ডাইনীর বাঁশি ঃ—স্বর্ণ মানবী। লোকাচার ও কুসংস্কারের জালে বন্দিনী—সে আজ ডাইনী। তার হৃদয়ে দয়া, মায়া, প্রেম, ভালবাসা সব আছে, অথচ তা প্রকাশ করতে পারে না, অন্যকে বিলিয়ে দিতেও পারে না কারণ সে ডাইনী। তার মা নাকি তাকে এই বিদ্যা দিয়ে গেছে। স্বর্ণ ভাল হতে চায়। তাই সে ঘরেতে বালিশে মুখ রেখে কাঁদে আর রাক্ষসী মাকে অভিসম্পাত দেয়। 'ডাইনী' গল্পেও সুরোধনী ভাল হতে চেয়েছে, সমাজে মিশতে চেয়েছে অথচ সে ডাইনী, তাই সে দেবীর কাছে মানুষ হওয়ার প্রার্থনা জানায়, বিনিময়ে বুক চিরে রক্ত দিতেও চায়।

কুলীনের মেয়ে ঃ—ধনী জমিদার ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যা তুলসীর বিয়ে হয় লম্পট স্বামী বহু পত্নীক বিপদতারণের সাথে। তুলসীর জীবনে ফুলশয্যার রাত থেকে শুধু কান্না আর যন্ত্রনা। স্বামী চোর, মাতাল, বহুপত্নীক তবুও তরু স্বামীকে বারংবার প্রশ্রয় দিয়েছে। হিন্দু সমাজের সংস্কারে আবদ্ধ তরু ব্যাভিচারী জীবনে যেতে পারে না, অথচ তার জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নি। তাই স্বামী বিপদতারণকে বহুবার ক্ষমা করেছে। শেষে তরুর সর্বস্ব চুরি করে বিপদতারণ পালিয়ে যায়। তরুর জীবনে নেমে আসে একাকীত্ব।

প্রতিমা ঃ—প্রতিমা তৈরীর মিস্ত্রী কুমারিশ ছোটবৌ-এর মুখের আদলে দেবী দুর্গার মুখ তৈরী করলে তা দেখে চির-বিরহিনী, মদ্যপ স্বামী-অত্যাচারিতা যমুনা গ্রামের কুৎসা ও স্বামীর ভয়ে ভীতা হয়ে একদিকে সংস্কারলব্ধ মন ও অন্যদিকে অবচেতন মনের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে খিড়কির ডোবায় আত্মহত্যা করে।

নারী ঃ—এই গল্পে নায়িকা নির্মলার চরিত্র বিচিত্র রহস্যে পরিপূর্ণ। ত্রিধারা বিস্তৃত তার জীবন। প্রথমপর্বে বিধবা হয়েও অন্তঃস্বত্ত্বা; দ্বিতীয় স্তরে বেশ্যা, মদ্যাসক্তা, তৃতীয় পর্বে নার্স। সে স্বভাব চঞ্চলা—বহুবল্লভ হয়েও সে প্রেম-সন্ধানী। সে প্রেমিককে খুঁজেছে কিন্তু পায় নি। নার্স হয়ে সুস্থ জীবনে অভ্যস্ত হয়েও আত্মহত্যা করেছে। শুভ্র প্রেমের

সন্ধান সে পেয়েছিল ডাক্তারবাবুর মধ্যে, তাই মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে ডাক্তারকেই সে মনের কথা বলেছিল। নির্মলার চরিত্রে সর্বদা একটি দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থেকেছে। রথীন্দ্রনাথ রায় তাই বলেছেন, "দেহ মনের এই দ্বন্দ্ব, এই দুঃসমাধেয় প্রশ্ন, পূর্ণতর পটভূমিকায় ও বলিষ্টতর প্রতিশ্রুতিতে আর একবার রূপ পেয়েছে। "সপ্তপদীর রীনা ব্রাউন চরিত্রে, মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় সংকেতে ও প্রেমরহস্যের জটিল জিজ্ঞাসায়" নারী গল্পটি তারাশঙ্করের এক বিশিষ্ট সৃষ্টি।" (১১)

৭। সামাজিক জীবনে বাস করেও বহু পুরুষ লোভী ঃ—আদিম প্রবৃত্তির বশে বশীভূত হয়ে নারী কখনও কখনও কামনাকে চরিতার্থ করতে বহুপুরুষের বাহুলগ্না হয়েছে, ব্যভিচারী জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে, অর্থের জন্যে অন্যপুরুষে আসক্তা হয়েছে। এরা সমাজে বাস করেও সামাজিক বন্ধন বা নিয়মকানুনের ধার ধারে না। কামনার বহ্নি জালে পুরুষকে বশীভূত করে। বিশেষ করে সমাজে বসবাসকারী নিম্নশ্রেণীর নারীদের মধ্যে বেশী প্রকট। বিলাস জীবন যাপন ও দেহজ ভোগের অতৃপ্তি বোধ করলেই এরা অন্য পুরুষের দেহলগ্না হয়। আদিম অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্রতা ও উন্মত্ত জৈবশক্তির উন্মাদনায় এরা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। দেহকে পণ্য করে এরা বহুপুরুষের ঘাটে নৌকা ভিড়ায়। 'যাদুকরী' সম্প্রদায়ের মেয়েরা সংসারে বাস করেও দেহরূপোপজীবিনী। সতীত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন।

বেদেনী ঃ—এই গল্পের নায়িকা রাধিকা। দুর্দম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে ঈর্ষা, ঘৃণা, প্রেম প্রকাশে সে কুণ্ঠিতা হয়নি। ধর্মহীন, নীতিহীন হয়ে জৈবশক্তির প্রাবল্যে দুরন্ত গতিতে সে ভোগ করে চলেছে শিবপদ, শম্ভু, কিষ্টোদের। শিবপদ প্রথম পুরুষ যে শান্ত ও সংযত, কিন্তু এই রূপ রাধিকাকে তুষ্ট করতে পারেনি। তাই দাম্পত্যের স্মৃতিকে অনায়াসে মুছে ফেলে শিবপদকে ভিখারী করে, তার সমস্ত অর্থ নিয়ে পালিয়ে আসে শম্ভুর কাছে। সেই শম্ভু বৃদ্ধ হয়েছে অথচ রাধিকার প্রবৃত্তিতাড়িত জৈবিক ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নি। তাই সবল বলিষ্ঠ, দৃঢ় স্বাস্থ্যের অধিকারী কিষ্টোবেদের জীবনে সহজেই ধরা দিয়েছে রাধিকা। স্বৈরিনী রাধিকা এত দিনের জীবনসঙ্গী শম্ভুকে ত্যাগ করার সময় তাকে পুড়িয়ে মারার জন্যে ঘুমন্ত শিবুর তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। "এই চরিত্র সৃষ্টি করে তারাশঙ্কর আদিম নারী মনের চিরন্তন অভীপ্সার ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন। রাধিকা চরিত্রটির আপাত অসঙ্গতির মধ্যে যে সমন্বয় সূত্রটি আছে তা সম্পূর্ণ মনস্তত্ত্ব সম্মত।" (১২) রাধিকা যখন যে পুরুষের সাথে থেকেছে তাকেই সম্পূর্ণরূপে ভালবেসেছে, আবার নতুনের দর্শনে সর্পিনীর ন্যায় ফোঁস করে অন্যের সাথে ঘর বেঁধেছে। সামান্যতম অনুশোচনা হয় নি তার। কেবল কামজ ভোগই তার জীবনে মুখ্য হয়ে উঠেছে।।

নারী ঃ—এই গল্পের নায়িকা নির্মলা বিধবা হয়েও পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে মালিকের ছেলে রমেনের সাথে থাকে। তার সন্তান হয় ও মারাও যায়। তারপর নির্মলা এক ধনীর নজরে পড়ে। মদ্যপান সুরু করে। শেষে ডাক্তারবাবুকেও ভালবাসতে শুরু করে, কিন্তু অনুশোচনায় বিষপান করে মারা যায়। উচ্চবংশীয়া হয়েও সে রমেনকে সহজে ত্যাগ করেছে। ধনীর কাছে থাকবার সময় প্রচুর অর্থ পেয়েছে, তথাপি রমেনের কাছে ফিরে যায় নি।

বেদের মেয়ে ঃ—বেদের মেয়ে শিবি এই গল্পের নায়িকা। এই সমাজের মেয়েরা অর্থের জন্যে ভদ্রসমাজের ধনীর ছেলেদের সাথে প্রেম করে বেড়ায়। শিবি ভোলাকে বিয়ে করার পরেও বারাঙ্গনার মত জীবিকা নির্বাহ করেছে। দারোগা, ইনস্‌পেক্টর এমন কি কনস্টেবল পর্যন্ত শিবিকে ভোগ করে অর্থের বিনিময়ে। সর্বদা স্বৈরিণী জীবন সে যাপন করেছে। ভদ্রঘরের ছেলে প্রভাতকে সে ভালবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি। ফলে শিবি বিবাহিত স্বামীকে বাঁচাতে প্রভাতকে হত্যা করেছে। এই শ্রেণীর মেয়েরা যাকে চায় তাকে যদি না পায় তবে তার উপর নির্মম হতে দ্বিধা করে না।

সাপুড়ের গল্প ঃ—বিচিত্র চরিত্র কালী বেদেনীর। সে বহুভর্তৃক, স্বৈরিনীও বুদ্ধিমতী। সে কোন পুরুষকে নিয়ে শান্তি পায় না সে তাই সর্বদা এক পুরুষসর্প কালীনাগ সাপকে ঝাঁপিতে করে কাছে রাখে। এক সন্ন্যাসীর সাথে তার পরিচয় হয়। তারা দুজনে থাকার মনস্থ করে। একসাথে মদও খায়। কিন্তু যখনই সন্ন্যাসী কালীকে বন্ধ্যাত্বকরণের ওষুধ খাওয়ানোর কথা বলে তখন থেকেই কালীর সব ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সে রাক্ষসী সাজে। পরিণতিতে সন্ন্যাসীকে নির্মম ভাবে হত্যা করে চলে যায়। মাতৃত্বের সুপ্ত বাসনা সদাই তার মনে ক্রিয়াশীল ছিল। কালী যা চেয়েছিল তা কোন পুরুষই হয়তো দিতে পারেনি।

রূপসী-বিহঙ্গিনী ঃ—প্রতিভাময়ী সঙ্গীতজ্ঞা রক্ষিতার কন্যা বিভাসেন। জীবনে বহুপুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছে। স্বামী পার্থ, বন্ধু সুরেন, ভবেশ প্রমুখ তার জীবনে এসেছে। হয়তো বাধ্য হয়েই তাকে এই পাপকাজে ব্রতী হতে হয়েছিল। তাই সে পুরুষজাতির এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে এক সুদর্শন সন্ন্যাসীর কাছে যায়, কিন্তু সন্ন্যাসীর দুর্ব্যবহার ও তার আভিজাত্য দেখে অসহ্য হয়ে বিভা সন্ন্যাসীকে হত্যা করে জেলে যায় এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়।

দেহের প্রদীপে রূপের শিখা ঃ—এই গল্পের নায়িকা সতী বিনোদের সাথে বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণকিশোরের সঙ্গে ঘর ছাড়ে।

প্রতীক্ষা ঃ—এ গল্পের নায়িকা পরী বাউরী। বাল্যবয়স থেকেই মিস্ত্রীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে রূপ দান করে। আখনাকে বিয়ে করেছে। আখনা পরীকে অত্যন্ত ভালবাসে অথচ দারিদ্র্য হেতু পরী আখনাকে ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে এক মুসলমান মরদের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। শেষে দুরন্ত যৌবন নিঃশেষ হয়ে যায় ও কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় কাটোয়ায় গৌরাঙ্গঘাটে ভিক্ষা করে।

ময়দান ঃ—এই গল্পের নায়িকা সুষমার মা এইভাবেই বহু পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েছে।

৮। বারাঙ্গনা ঃ—আগে রাজা, মহারাজা, জমিদার, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্তারা অবসর বিনোদন করতে বাঈজী ও রক্ষিতা রাখতেন। প্রাচীনকালের শূদ্রকের রচিত "মৃচ্ছকটিকম্" গ্রন্থে নটী বসন্তসেনার উল্লেখ আছে। রক্ষিতা বা বারাঙ্গনাদের সমাজে ঠাঁই হত না। তাদের প্রজন্মের সামনে কেবল খোলা থাকত পূর্বপুরুষদের প্রদত্ত জীবিকা। বৃটিশরা এদেশে আসার পর তাদের অধিকাংশই অবসর সময়ে মদ্যপান করতো, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে এদেশের বাবুরা উপঢৌকন দিত এই দেহপসারিণীদের। এরা উচ্চ সমাজে ঠাঁই না পেয়ে কখনও নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের সাথে সংসার বাঁধে। আবার বেশীরভাগই বংশানুক্রমে এই পঙ্কিল ব্যবসায়ে নিমজ্জিত হয়। নিম্নজ শ্রেণীর বন্ধনহীন জীবনে বিলাসিনী মেয়েরা গ্রাম্য মেলায় গিয়ে অর্থের জন্যে পুরুষদের সঙ্গিনী হত।

এই বারাঙ্গনাদের জীবন বড়ই করুণ। যতদিন যৌবন থাকত ততদিনই তাদের রোজগার ও কদর থাকত। তারপর এদের জীবন ভিখারিণীর ন্যায় অতিবাহিত হত। মূলতঃ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণেই তারা বারাঙ্গনা হতে বাধ্য হয়েছে। স্বেচ্ছায় আবার অনেকে এই বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই কদর্য জীবনের মাঝে অনেকের জীবন মহত্বে মহীয়ান। এদের প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা বহুধা বিভক্ত হলেও এদের মধ্যে মাঝে মাঝে ত্যাগ, ক্ষমা, প্রেম ভালবাসা দিশাহীনকে দিশা দেখায়, লক্ষ্যহীন মানুষকে লক্ষ্যস্থির করতে সাহায্য করে—আবার অনেকে হারিয়ে যায়। সুবোধ ঘোষের "স্নানযাত্রা"য় সমাজসেবক ইন্দুনাথ মেলা থেকে বেশ্যাপল্লী তুলে দিতে গিয়ে বেশ্যা সোনালীর কাছে হারিছে গেছে। ডাক সাইটে বেশ্যার কাহিনী পাওয়া যায় সুবোধ ঘোষের 'বারবধূ'তে। তারাশঙ্করের কয়েকটি গল্পে বারাঙ্গনাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্পেও এক অসহায় বাল্য বিধবা পতিবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

মেলা ঃ—"মেলা বাংলাদেশের এক ঐতিহ্য। বিভিন্ন কারণে মেলা বসে। কোথাও একদিন, আবার কোথাও দুই থেকে একমাস পর্যন্ত চলে। মেলা ও তার উৎস সম্পর্কে 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা' গ্রন্থ থেকে একটি সারণী উল্লেখ করা যেতে পারে।" (১৩)

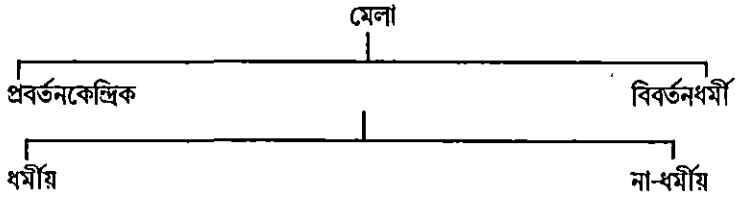

'মেলা' গল্পটি লেখার পশ্চাতে লেখক তাঁর সাহিত্য জীবনগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—"মাঘমাস শ্রী পঞ্চমীর পরদিন শীতলাষষ্ঠীতে আমাদের ওখান থেকে পনেরো মাইল দূরে দৈথী বৈরাগীতলায় বৈষ্ণব সাধক গোপালদাস বাবাজীর আবির্ভাব তিথিতে মেলা। সেই মেলায় চলে গেলাম। দুরন্ত শীত তখন। আশ্রয় নিলাম এক গাছতলায়। সেইখানেই ইট দিয়ে উনান তৈরী করে একবেলা খিচুড়ি রান্না করে দুবেলা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম তিনদিন।" (১৪) এই গাছতলায় বসেই 'মেলা' গল্পটি লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। দিনের আলোয় বিচিত্র মানুষের আগমন, হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হলেও রাত্রে এর চিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেত। লেখক নিজেই বলেছেন, "রাত্রি তিনটে অবধি মেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে দাঁড়িয়ে জুয়াড়ীদের জুয়ার-উন্মত্ত মানুষদের লক্ষ্য করেছি, পাপপঙ্কিল প্রকাশ্য বেশ্যা বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষের পাশব উন্মত্ততা লক্ষ্য করেছি। ক্লান্ত হলে ফিরে এসে গাছতলায় খড়ের বিছানার উপর বসে লণ্ঠনের শিখা বাড়িয়ে দিয়ে খাতা-পেন্সিল দিয়ে লিখতে বসেছি।" (১৫)

এই মেলাতে এসে অমর ছোটবোনকে হারিয়ে ফেলে। মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে আশ্রয় দেয় এক বারাঙ্গনা—নাম তার কমলি। রাত্রে এই মেয়েটির সংবাদ পেয়ে সেখানকার কর্ত্রী (মাসি) তাকে বিক্রি করার কথা বলে এবং ভোর রাতে মেয়েটিকে নিয়ে যাবে বলে। এক অনির্বচনীয় বাৎসল্য প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে গণিকা হয়েও কমলি মেয়েটাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের কুৎসিত জীবন ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। আপাত দৃষ্টিতে জঘন্য জীবন যাপন করলেও কমলির এই মহানুভবতা সত্যই মানবিক ঔজ্জ্বল্যে প্রোজ্জ্বল। কমলি এই পথকে ঘৃণা করেছে। সে বুঝতে পারে যে এই

অবোধ শিশুটির ভবিষ্যতেও এই কদর্য জীবন নেমে আসবে—তাই কমলি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ায়। গণিকা শুধু বিলাসিনী বা ছলনাময়ী নয়, তাদেরও হৃদয়ে দয়া, মায়া, প্রেম, মমতা যে থাকতে পারে, তারাও মা হতে পারে—তারই দৃষ্টান্ত কমলি চরিত্রটি।

প্রসাদমালা ঃ—বৈষ্ণব পরিবারের বিধবা চিত্তকালীর কন্যা ললিতা। বাল্যবয়সে বিয়ে হয় হরিমোড়লের ছেলে গোপালের সঙ্গে। হরিমোড়লের লালসায় চিত্ত সব সম্পত্তি খোয়ায়। হরিমোড়ল এরপর চিত্তর শরীরের দিকে তাকালে চিত্ত মেয়েকে নিয়ে কলকাতা যায় এবং গোপাল কীর্ত্তনের দলে চলে যায়। চার-পাঁচ বছর পর সংসারে ফিরে এসে গোপাল দেখে তার বাবা মারা গেছে। ললিতাকে ঘরে আনবার জন্য কলকাতা গিয়ে বহুসন্ধানের পর ললিতাকে পায় এবং গ্রামে আনে। গ্রাম্য জীবনকে ঘৃণা করতে থাকে ললিতা। বিলাসিনী ললিতা ঘর ছাড়ে। গোপাল দ্বিতীয় বিয়ে না করে কীর্ত্তনের দলে যোগ দেয়। আসলে জৈব ক্ষুধার সঙ্গে বিলাসী জীবনের মোহ ললিতাকে ওই পথে যেতে সাহায্য করে। শেষে অবশ্য মিল হয়েছে। এ ছাড়া তারাশঙ্করের 'রাধারানী', 'ময়দান', 'মুহূর্ত' প্রভৃতি গল্পে বারাঙ্গনাদের উল্লেখ আছে।

৯। ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ঃ—সেবা ও ত্যাগধর্মে নারীজাতির ঐতিহ্য বহুজনবিশ্রুত। নিজের অনলে পুড়ে অপরের মঙ্গল তারা করে। বিরাট প্রত্যাশা একলহমায় ত্যাগ করে—সর্বত্যাগিনী মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। ধাত্রীপান্নার ত্যাগ সর্বজনবিদিত। সমস্ত সুখ, আকর্ষণ বির্সজন দিয়ে এরাই স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। শীর্ণশরীর শচীশের জন্যে দামিনীর উৎকণ্ঠা (চতুরঙ্গ/রবীন্দ্রনাথ), গোবিন্দলালের জন্যে ভ্রমরের আত্মত্যাগ (কৃষ্ণকান্তের উইল/বঙ্কিমচন্দ্র) কিংবা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে 'শাস্তি'র চন্দরার ত্যাগ ও আশাপূর্ণাদেবীর ছোটগল্প "অনাচার"-এর সুভাষ-কাকীমার বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যে সর্বস্বত্যাগ—এ কেবল নারীজাতির পক্ষেই সম্ভব। তারাশঙ্করের বেশ কয়েকটি গল্পে নারীর অভাবনীয় ত্যাগের কাহিনী আছে। যেমন—

না ঃ—স্বামী-হন্তা অনন্তকে যথাযথ শাস্তি প্রদানের সংকল্পে কালীনাথের সতীসাধ্বী স্ত্রী ব্রজরাণী, "আজ আট বৎসর ব্রজরাণী অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছে। তৈলহীন স্নান, আপন হাতে হবিষ্যান্ন আহার, মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া সে এই দিনটির প্রতিক্ষা করিয়া আছে। কিন্তু আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিমর্ষ, বিবর্ণ, নুব্জ্যদেহ, ক্ষতবিক্ষত হৃদয় অনন্তকে দেখে তাকে ক্ষমা করেছেন। স্বচক্ষে স্বামীহন্তাকে দেখেও সরকারী উকিলের প্রশ্নের উত্তরে ব্রজরাণী শুধু "না" বলেছেন। এ ক্ষমা সন্তানের প্রতি স্নেহময়ী মায়ের করুণা। ব্রজরাণীর "না" শব্দটিকে ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ব্যাখ্যা করেছেন তিনটি স্তরে। "প্রথম স্তর"—দৃঢ়তার ও সংকল্প কঠোর মনের, দ্বিতীয় স্তর—ক্ষমার। তৃতীয় স্তর—গভীর প্রশান্তির।" (১৭)

একপশলা বৃষ্টি ঃ—বহু পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েও শেষে চন্দ্রচৌধুরীর ভালবাসার শৃঙ্খলে বাধা পড়েছে জয়া। বাউরী সমাজে জন্মগ্রহণ করেও সমাজে অনেক ধনীর আহ্বান পেয়েও জয়া স্বর্গত চন্দ্রের বর্তমান সংসারের স্ত্রী ও দুই সন্তানের দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছে। দারিদ্র্যে অনাহারে জর্জরিতা হয়েও ধনীব্যবসায়ী দে পরিবারের সেজবাবুর প্রলোভনকে জয় করেছে—মিস্ত্রীদের দেহজ প্রবৃত্তির আহ্বানকেও উপেক্ষা করেছে।

এছাড়া 'প্রসাদমালা' গল্পে অর্থ, সম্পত্তি ও দেহ লোভাতুর হরিমোড়লের লোলুপ দৃষ্টির কাছে নিজেকে বাঁচাতে বিধবা চিত্তকালী বেয়াই হরিমোড়লকে নিজের সবসম্পত্তি অকাতরে দান করে বিবাহিতা কন্যাকে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়িয়েছে।

"শ্মশান বৈরাগ্য" গল্পে সুদখোর, কুসীদজীবী, অর্থলোলুপ, অর্থগৃধ্নু মহিম বাঁড়ুজ্জে বিধবা-বাড়ীতে আকণ্ঠ ভোজন করেছে, দিদির শ্রাদ্ধের জন্যে খরচের সামান্য পাঁচশো টাকা খরচ করেও হা হুতাশ করেছে। অকৃতদার মহিম নির্লজ্জের মত সহায় সম্বলহীনা ভাগিনীর শেষ সম্বল সোনার পুটুলিটা নিয়েছে। মায়ের আত্মার যাতে শান্তি হয়, মামা বাবুর লালসা যাতে পরিতৃপ্ত হয় তার জন্যে সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে বিভা অথচ নিজের জন্যে সামান্যতম ভাবে নি।

১০। প্রেমজ বিবাহ ঃ—প্রতিলোম

বিবাহ একটি সামাজিক বন্ধন। যুবক ও যুবতীর পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে বিবাহের ব্যবস্থা করে। বিবাহ সমগোত্রীয় হয়ে থাকে। কিন্তু প্রেমজ বিবাহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পিতামাতার অমত থাকে কারণ, বেশীর ভাগ বিবাহই—.....প্রতিলোম বা অনুলোম হয়ে তাকে। কিন্তু এই বিবাহে দম্পতির প্রেম প্রায়শঃই নিগূঢ় হয়ে থাকে যদিও বিরহ বা বিচ্ছেদের অভাব নেই। তারাশঙ্করের গল্প "দীপার প্রেম" "রূপসী বিহঙ্গিনী" ইত্যাদিতে এর উদাহরণ মেলে। 'সুতপার তপস্যা" উপন্যাসেও সুব্রত মুখার্জী এবং সুতপা দাশগুপ্তের প্রেমজ বিবাহ হয়েছে।

দীপার প্রেম ঃ—অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে দীপা বিয়ে করল সকলের অমতে এমন যুবককে যে তার ঠাকুরমা সত্যদাসী এককালে তাদেরই (দীপা) বাড়ীতে দাসীর কাজ করত। জাতিতে কাওড়া বা যুগী। তারই নাতি দেবপ্রিয় হালদার অধ্যাপক। দীপা তার পিতামহীকে বলেছিল, জাতির বিচার না করে ভালবাসার প্রতিদানেই

তাকে সে বিয়ে করেছে। কিন্তু এ বিয়ে সুখের হয় নি। দীপা বিধবা হয়েছে। বন্ধু রঞ্জিত দীপাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল কিন্তু দীপা রাজী হয় নি। দীপার হৃদয় জুড়ে দেবপ্রিয়র ভালবাসা চিরকাল ছিল তাই দীপা অন্য কাউকে হৃদয়ের আসনে স্থান দিতে পারেনি। দীপার এ প্রেম সাবিত্রী-সত্যবানের প্রেম—যা মহিমময় চিরশুভ্র ও মধুময়।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ—এই গল্পের নায়িকা বিভা সেন পার্থ মুখার্জীর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা বিনিময় করে বিয়ে করে। কিন্তু এ ভালবাসা ছিল মেকী। তাই পার্থ সুরেনকে চার হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে। ভবেশ বাবু আবার চার হাজার টাকা দিয়ে সুরেনের কাছ থেকে বিভাকে কিনে নেয়। এখানে প্রেমজ বিয়ে হয়েও বিভা জীবনে শান্তি পায় নি—বহু পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েছে।

১১। বিলাসিনী ঃ—নারী যেমন ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা তেমনি কেউ কেউ উগ্র আধুনিকতার ছোঁয়ায় বিলাসিনী সাজতে চায়। বিলাস-ব্যসনকে চরিতার্থ করতে মরিয়া হয়ে কেউ স্বামী সংসার, বন্ধন সব তুচ্ছ করেছে ঃ সাময়িক তাড়নায় ঘর ছেড়ে কেউ বারাঙ্গনা হয়েছে, কেউ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি—যেখানে প্রেম, ভালবাসা, মমতা সব মিথ্যে হয়ে যায়। তারাশঙ্কর মুখ্যতঃ পল্লীজীবনের বন্ধনহীন মানুষের রূপকার। "প্রত্যাখ্যান" গল্পে ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাত্য মেয়ে নিয়ে ঘর ছাড়ে। ব্রাহ্মণ কন্যা কুমারী অবস্থায় মা হয়েছে এবং লোকনিন্দার হাত থেকে বাঁচতে আত্মহত্যাও করেছে—অনেকের মতে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

কুশপুত্তলী ঃ—লাজুক, ভদ্র, শান্ত স্বভাব ব্রাহ্মণ পুত্র নিরঞ্জন, পিতৃমাতৃহীন। বাল্যবিবাহিতা স্ত্রী কিশোরীকে সে ঘরে আনে সুখের জন্যে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে উগ্র বিলাসি তাই কিশোরীকে ঘর ছাড়াতে বাধ্য করে। এক রাতে কিশোরী হারিয়ে যায় এবং নিরঞ্জন কলকাতার গলিতে গলিতে খুঁজে ফেরে।

প্রতীক্ষা ঃ—নিকষ কালো অথচ রূপবতী বাউরী ঘরের মেয়ে পরী প্রথম জীবনে রাজমিস্ত্রীদের সুনজরে পড়ে, দেহের বিনিময়ে টাকা পয়সা পেয়ে দামী শাড়ি, রূপচর্যার বহু বিলাসী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে সাজগোজ করে ঘুরে বেড়ায়—শেষে আখনাকে বিয়ে করে। কিন্তু আখনার দারিদ্র্যের সংসারে পরী খাপ খাওয়াতে পারল না। বিলাসিনী পরী তাই মুসলমান হয়ে ঘর ছাড়ে এবং সুখের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। রূপ ও দেহের ক্ষুধার আকর্ষণে ঘর ছাড়লেও শেষ জীবনে দুরন্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অন্ধপরী ভিক্ষা করে। প্রেমিক আখনা পরীকে পেয়েও গ্রহণ করে নি।

সনাতন—এই গল্পে সনাতন জমিদার বাড়ির চাকর—অত্যন্ত সৎ ও সরল। তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ প্রভাতী বিলাসিনী। "চলনে বলনে, আহারে রুচিতে পোষাকে প্রসাধনে সনাতনের বিপরীত।" প্রভাতী নিজের বিলাসিতার জন্যে সনাতনকে চুরি করতে প্রলুব্ধ করে। সনাতন এই কথায় অত্যন্ত রেগে যায় এবং প্রভাতীকে প্রহার করে। প্রভাতীও মাসখানেক পরে সনাতনের যথাসর্বস্ব নিয়ে বাবুদের চাপরাশীর সঙ্গে পালিয়ে যায়। যাবার আগে "বেদেনী" গল্পের রাধার মত প্রভাতীও স্বামী মৃত্যুর কামনায় বটির কোপ বসায়।

প্রসাদমালা—এই গল্পের নায়িকা ললিতা মায়ের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে শহুরে ছোঁয়ায় অবগাহন করে। তাই স্বামী গোপাল যখন দীর্ঘদিন পর স্ত্রী ললিতাকে গ্রামে নিয়ে আসে তখন অজপাড়াগাঁয়ের গ্রাম্য পরিবেশ ললিতা গ্রহণ করতে পারেনি। তাই একদিন গোপালের যথাসর্বস্ব নিয়ে সে পালিয়ে যায়—গোপালের শুভ্র প্রেমের কোন মর্যাদা দেয়নি আধুনিকা ললিতা।

১২। প্রেম—তারাশঙ্কর নিজেই স্বীকার করেছেন—"আমি জানি এবং পাঠকেরাও জানেন প্রেমের গল্প আমার বেশী নেই, প্রেমের গল্পে আমি কিছু আড়ষ্ট।" [১৭] যখন পরকীয়া প্রেমচর্চা কল্লোলীয়গণ বিচিত্র আস্বাদনে গ্রহণ করেছেন, তখন তারাশঙ্কর এই ধরণের চিত্তাকর্ষী রোমান্স সৃষ্টির জন্যে প্রেমের গল্প লিখলেন না। কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু তাই বলেছেন, **"Another aspect, I find Tarasankar lacking in is what our Sanskrit aesthcticians called the adirasa or the primary feeling."** [১৮] তিনি সমাজের অন্তেবাসী জীবনে প্রেমের লীলাকে সাবলীলভাবে চিত্রিত করেছেন। তাঁর গল্পে প্রেম স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে। তরল চটুল প্রেমে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। প্রেম চেতনাকে বিচ্ছিন্নভাবে না ভেবে তিনি গোটা জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাই তিনি প্রেমের গল্পে আড়ষ্ট ছিলেন না। "তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পের তিনটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ঃ ক) তারাশঙ্করের তথাকথিত "বিশুদ্ধ" প্রেমের গল্পের অভাব, তবে প্রেমানুভূতি একাধিক ভাবানুষঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। খ)

তারাশঙ্করের প্রেমের গল্পে তারুণ্যের রসোচ্ছলতার চেয়ে প্রৌঢ়ত্বের ভাবস্থির অনুভবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। গ) তাঁর প্রেমের গল্পের পরিণতি সাধারণতঃ মিলনাত্মক হয় না এবং সুলভ রোমান্সের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই নেই।" (১৯) "রসকলি"র নায়িকা মঞ্জরী সামাজিক অনুশাসনকে মেনে নিয়ে যৌবনেই বৃন্দাবন যাত্রা করেছে। "রাইকমল" এর কমলিনী লোকনিন্দা, কুৎসা, সকল কিছুকে উপেক্ষা করে দেহাতীত সৌন্দর্য প্রেমের আরাধনায় রত হয়েছে। "হারানো-সুর"-এ গিরি স্বামীকে ছেড়ে বৃন্দাবন যেতে গিয়েও স্বামী ননীর বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়েছে। বৃন্দাবন যাবার বাসনা ত্যাগ করে সব অভিমান ভুলে স্বামীর চরণকেই বৃন্দাবন ভেবেছে।

স্বকীয়া প্রেমের কাহিনী তারাশঙ্করের কলমে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। "মতিলাল" গল্পে মতিলাল ও ভুবন উভয়েই কুৎসিত। সন্তান নেই বলে দুঃখ, তথাপি তাদের দাম্পত্য প্রেমে স্বর্গীয় সুধা ঝরে। মতিলাল [redacted] বিয়ের দিন সন্ধ্যায় খড়ির গুঁড়ো এনে জলেগুলে ভুবনকে মাখায়, ভাবে কালো সুন্দর হয়। আয়নায় নিজের মুখ দেখে উল্লসিত হয়ে সেও মতিলালকে মাখাতে চায়। আবার "তারিণী মাঝি" গল্পে তারিণী ডুবন্ত ঘোষের বউকে উদ্ধার করে পুরস্কার স্বরূপ বউ সুখীর জন্যে নাকের নথ ও দুখানা শাড়ি চেয়েছে। নথটা নিয়ে বাড়ি ফিরে রাতের বেলাতেই সুখীকে পরিয়ে ছেড়েছে। আয়নার সামনে বসে সুখী নথ পরতে বসে, তারিণী ভাত খাওয়া বন্ধ করে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে, আলো নিয়ে সুখীকে দেখতে যায় এবং সুখীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মুখখানি লজ্জায় রঞ্জিত হয়ে ওঠে—এগুলি নির্ভেজাল দাম্পত্য প্রেমের চিত্র।

প্রেমের পরম তৃষা "তমসা" গল্পের কুৎসিত বিকলাঙ্গ পঙক্ষীকে জীবসীমার উর্ধ্বে নিয়ে গেছে। বিনোদের প্রত্যাখ্যান ও পদাঘাতে জর্জরিত "ঘাসের ফুল" এর কয়লাখনির মেয়ে শ্রমিক চূড়কীর প্রেমের স্নিগ্ধতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিটোল প্রেমের কাছে বিনোদ পরাজিত হয়েছে কিন্তু চূড়কী হয়েছে জয়ী।

"দীপার প্রেম" গল্পে দীপার দেবপ্রিয়র প্রতি যে প্রেম তা তুলনাহীন। প্রথম যৌবনেই স্বামীকে হারিয়েও অন্য কাউকে সুযোগ পেয়েও চিন্তা করেনি—স্বামীর প্রতি ভালবাসা আমৃত্যু ক্রিয়াশীল থেকেছে। "ময়দান" গল্পে নিশীথ রাত্রে রহস্যময়ী নায়িকা ভিক্ষার ছলে খুঁজে বেড়ায় প্রত্যাখ্যাত প্রেমিককে। আবার 'কবি' গল্পে নিতাই তার প্রেমিকাকে না পেয়ে বহুদূরে যাত্রা করেছে। ঠাকুরঝি নিতাইকে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু জয়া বাউরী ত্যাগ করতে পারেনি প্রেমিক চন্দ্র চৌধুরীকে বা তার স্ত্রীসন্তানদের (একপশলা বৃষ্টি)। জয়া আমৃত্যু তিলে তিলে আত্মহনন করেও কামনা বা লালসার আগুনে পুড়ে মরেনি। তার প্রেমের গভীরতা অসীম ও অনন্ত।

"প্রেমের মানচিত্র বোধহয় নীল, নীল-আদিগন্ত নীল। ঘটনার শাদা শাদা সরু সরু সমস্ত রেখাই সেই আকাশনীল, সমুদ্রনীল বিস্তারে মুদ্রিত। তারাশঙ্করের প্রেমের গল্প পড়তে পড়তে সেই কথাই পুনর্বার মনে আসে।" (২০)

১৩। মিথ্যাভাষিণী—মিথ্যাকথা বলা, মানুষের মজ্জাগত। শুধু আত্মীয় স্বজনেরই নয়, নিজেকেও বড় দেখানোর একটা "অহং" বোধ কাজ করে। "তাসের ঘর"-এ যেখানে শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে অকারণে মিথ্যাভাষণ দেয় গৃহবধূ যুবতী শৈল। শৈল বিনীত, নম্র, মিষ্টভাষী, সুন্দরী। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে বাপের বাড়ির সম্বন্ধে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলে যার অধিকাংশই মিথ্যা। আবার বাপের বাড়িতে গিয়ে শ্বশুর বাড়ির সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত মিথ্যা কথা বলেছে। এটা শৈলের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে শৈল আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সামনে মিথ্যা করে তার বর অমর প্রায়ই বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ একশো টাকা নিয়ে আসে—এই কথা বললে অমর তা শুনে বৌকে এলাহাবাদে (শৈলের বাপের বাড়ি) রেখে আসে। অমর সবার অলক্ষ্যে শ্বশুরবাড়িতে জলস্পর্শ পর্যন্ত করে না। বাপের বাড়িতেও সে একইভাবে মিথ্যা কথা বলে তাসের ঘর ভাঙতে থাকে আবার গড়তে থাকে। পরে শাশুড়ী ব্যাপারটাকে বুঝতে পারেন এবং বধূকে ক্ষমা করে গৃহে নিয়ে আসেন।

১৪। অভিনেত্রী—অভিনয় ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও প্রথম পর্বে নারীদের অভিনয়ের সুযোগ ছিল না। ধীরে ধীরে বাংলাদেশে নাটকে, যাত্রায়, পালাগানে নারীদের প্রবেশাধিকার ঘটে। বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নারীদের অভিনয়ে সুযোগ ঘটে। যাত্রাগান সারাবছর ধরে গ্রামগঞ্জে হত। সমাজের অসহায় মেয়েরাই প্রধানত এতে অংশ নিত। অনেকেই ছিল নিম্নবংশীয়া। ফলে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এসে নটীগণ মদ্যপান ও দেহদান করত। অনেক সময় সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীগণ বিধবা হয়ে সমাজের নিষ্ঠুর চাপে তারা কখনও বারাঙ্গনা, কখনও যাত্রা দলে যোগ দিত। মূলতঃ প্রথম পর্বে বারাঙ্গনা সমাজের নারীরাই অভিনয়ে

আসত। অনেক পুরুষ এই নটীদের সংস্পর্শে এসে সমাজ, সংসার অনায়াসে ত্যাগ করেছে। রবীন্দ্রনাথের "মানভঞ্জন" গল্পে স্বামী ঘরে রূপসী বৌ থাকতেও অভিনেত্রীদের সঙ্গে সহবাস এবং তাদের একজনকে নিয়ে বিদেশ গমন করেছে। সংসার ও স্বামী গিরিবালাকে অভিনেত্রী ও পতিতা সাজিয়েছিল। "সেকালে পেশাদারী মঞ্চে অভিনেত্রী জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে দেহজীবিকা মিশে থাকত। ক্ষীরোদাদের (বিচারক) পতিতাবৃত্তির তুলনায় তাতে কিছু পালিস থাকত। হয়ত এই পালিসের চোখ ধাঁধানো লোভে ঐ পথে মুক্তি খুঁজেছিল গিরিবালা। সঙ্গে একথাও বুঝিয়ে দিতে কার্পণ্য করেননি লেখক (রবীন্দ্রনাথ) যে সংসার এবং স্বামী তাকে ঐ দিকে ঠেলে দিয়েছিল।" (২১)

তারাশঙ্করের "রূপসী বিহঙ্গিনী", "অভিনয়", "শেষ অভিনয়" প্রভৃতি গল্পে অভিনেত্রীদের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। গল্পগুলিতে অভিনেত্রীদের জীবনে শান্তি বা মিলন হয় নি—প্রত্যেকে বিচ্ছেদের বিরহে বিরহিনী।

অভিনয় ঃ প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে জন্ম হয় নট ও নাট্যকার অংশুমানের সঙ্গে সীতা সেনের পরিচয়। প্রথমে অভিনয় সুন্দর করতে না পারার জন্যে অংশুর কাছ থেকে ভর্ৎসনা পরে সুন্দর অভিনয়ের জন্যে অংশুর হৃদয় টলে যায়। সে সীতাকে ভালবাসার কথা জানায়, কিন্তু সীতা সেন "না" বলে চলে যায়। "অভিনয় কোনদিন সত্য হয় না"—এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে চিরকাল একা থেকেছে নায়িকা সীতা। শেষ জীবনে অভিনয় ছেড়ে সাহিত্যিক শিবনাথবাবুর সুপারিশে এক আধা-সরকারী নারী-প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তার জীবনেও অভিনয় শেষ হয়ে যায়।

রূপসী বিহঙ্গিনী ঃ প্রেমজ বিয়ে। সংগীতজ্ঞ পশ্চাত্ত্য সংগীতে খ্যাতি অর্জন করা পার্থ মুখার্জী বিভাকে বিয়ে করে। ভালবেসে নাম পরিবর্তন করে সুচন্দ্রা রাখে কিন্তু কিছুদিন পর পার্থ অভিনয়ের জগতে স্ত্রীকে আনে এবং বন্ধু সুরেণের কাছে মাত্র চার হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়। সুচন্দ্রা অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভবেশের সাথে তার পরিচয় হয়। সুরেণ সুচন্দ্রাকে ভবেশের কাছে চার হাজার টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। এরপর সুচন্দ্রা এক সুদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখতে যায়। সেখানে কয়েকদিন পর সুচন্দ্রা সন্ন্যাসীকে হত্যা করে এবং বিচারে তার ফাঁসি হয়। তার জেলের গারদে বসে একটাই প্রশ্ন—"হে ঈশ্বর, তুমি বলো, কেন আমি এ কাজ করলাম।" এখানে পাঠকদের মনেও জিজ্ঞাসা সন্ন্যাসীকে সে এমনভাবে খুন করল কেন? মনে হয় সন্ন্যাসী হয়ত পার্থ মুখার্জী—যে বিভাকে সুচন্দ্রা, রূপসী বিহঙ্গিনী তৈরী করেছে। অথবা সন্ন্যাসীর দুর্ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সুচন্দ্রা সমগ্র পুরুষজাতির উপরেই ঘৃণা করতে থাকে, যার কারণেই সন্ন্যাসীকে হত্যা করে।

শেষ অভিনয় ঃ— তারাশঙ্কর "মঞ্জরী অপেরা" রচনা করার পর একাধিক গল্প লেখেন যেখানে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কাহিনী আছে। অভিনেতা বাপ্পা বোস দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' নাটকে গোলাপী নামে এক রঙ্গিনী মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই অভিনয়ের পর বন্ধু রমাপতির বাড়ি রাতে খাওয়া ও থাকার নিমন্ত্রণ ছিল। তাই বাপ্পা রাতে খেয়ে একটা ঘরে একা শুতে যায়। মাঝ রাতে ঘরে দেখে যে সে 'বিরহ' নাটকে যে গোলাপী নামের মেয়েটার রোল করেছিল অবিকল গোলাপীর মত এক রমণী—গোলাপীর মত তারও কাঁখে কলসী। সে হল রমাপতির বিধবা দিদি সুমতি। চোদ্দ বছরে বিয়ে, আর পনেরো বছরে সে বিধবা হয়েছিল। কিছুক্ষণ রাত্রে অন্ধকার ঘরে দুজনে থাকাকালীন বাইরের লোকজন তাদের ধরে লাঞ্ছিত করে। এই দুঃসংবাদে বাপ্পার বাবা বাপ্পাকে ত্যজ্যপুত্র করে দেয়। বাপ্পা তার পর অভিনয়ের জগতেই থেকে যায়। অবশেষে পঞ্চাশ বছর বয়সে "মদন ভস্মের পরে" নাটকে অভিনয় করে। এটাই তার শেষ অভিনয়। নায়িকা বিনোদিনী। বিনোদিনীকে দেখে বাপ্পা সুমতির কথা ভাবে। কারণ বিনোদিনী সুমতির মতই হুবহু দেখতে। কিন্তু নাম জিজ্ঞাসা করলে বিনোদিনী নিজেকে বিনোদিনী বলেই পরিচয় দেয়। পরে সে আর অভিনয় করেনি—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। সুমতিই হয়ত বিনোদিনী। প্রথম যৌবনের প্রেমকেই শেষবারের মত আস্বাদ করে নিজের পরিচয় গোপন করে জীবনাহুতি দিয়েছে।

যাত্রাগান বাংলাদেশের প্রাচীন সংস্কৃতি। যাত্রাদলের নরনারীর জীবন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে বাঁধা। এরা মূলতঃ বোহেমিয়ান—সুরাসক্তি, যৌন আকর্ষণ, একপ্রকার অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণা সদা বর্তমান। এদের মধ্যেও পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বেষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মান-অভিমান, ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটে থাকে। তারাশঙ্কর যাত্রাগানের নট-নটীর জীবনবেদ অত্যন্ত বাস্তব তুলিতে অঙ্কন করেছেন। তাঁর "মঞ্জরী অপেরা" (বৈশাখ ১৩৭১) এসবেরই জীবন্ত দলিল। একটি যাত্রাদলের নট-নটীদের সেখানে জীবন কাহিনী বিধৃত—"সমাজে যাহারা অপাংক্তেয় এইরূপ এক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিয়া, উহাদের চাল-চলন, ধরণ-ধারণ ও বে-পরোয়া, অথচ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে ও আদর্শ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োজিত জীবনচর্যার বর্ননা দিয়া এবং উহাদের ক্বচিৎ প্রকাশিত গভীরতর হৃদয়াবেগের পরিচয় দিয়া কথা শিল্প জগতে একটি অনন্য স্থান অধিকার করিয়াছে ও তারাশঙ্কর প্রতিভার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে।" (২২)

এ অধ্যায়ের আলোচনায় তারাশঙ্করের ছোটগল্পে নারী চরিত্রের রূপ ও স্বরূপের যে বৈচিত্র্য প্রকাশিত তাতে তাঁকে সার্থক-ধনা নারী জীবনের নিপুণ চিত্রকর বলা যায় স্বচ্ছন্দে।

পাদটীকা

১। ফ্রয়েড—সুনীল কুমার সরকার পৃ - ১২৮

২। কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ - ১৮৮

৩। প্রাগুক্ত পৃ - ২০৮

৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—ভূদেব চৌধুরী পৃ - ৪৬৫

৫। বাঙলা উপন্যাসে কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৩৪৬

৬। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৫৩২

৭। কল্লোল যুগ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃ - ১৭

৮। কৈশোর স্মৃতি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৯৪

৯। কালের পুত্তলিকা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় পৃ - ৭৫

১০। তারাশঙ্কর—দেশ, কাল, সাহিত্য—ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার পৃ - ১৬২

১১। গল্পপঞ্চাশৎ এর ভূমিকা—রথীন্দ্রনাথ রায় পৃ - ২৫

১২। প্রাগুক্ত পৃ - ১৩

১৩। মেলা রবীন্দ্রনাথ—ডঃ সনৎকুমার মিত্র—লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (মাঘ/চৈত্র-১৩৯৮) পৃ - ১৮১

১৪। আমার সাহিত্য জীবন ১ম খন্ড—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৯৩

১৫। প্রাগুক্ত পৃ - ৯৪

১৬। গল্প পঞ্চাশৎ এর ভূমিকা—রথীন্দ্রনাথ রায় পৃ. (৫১)

১৭। স্বনির্বাচিত গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভূমিকা

১৮। Buddhadev Bose- An Acre of Green Grass (Papyrus Edn.) P-94

১৯। তারাশঙ্কর ঃ দেশকাল সাহিত্যে ঃ ডঃ উজ্জ্বল কুমার মজুমদার পৃ - ১০৯

২০। প্রাগুক্ত পৃ - ১৬৪

২১। রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের সমাজতত্ত্ব—ক্ষেত্রগুপ্ত পৃ - ৯৬

২২। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ - ৫৯৯

* * * * * * * * * *